বাংলাদেশ
এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা

ISSN 1609-4409

উনচল্লিশতম খণ্ড	শীত সংখ্যা	পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

সম্পাদক
সৈয়দ আজিজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
মো. আবদুর রহিম

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
৫ পুরাতন সচিবালয় রোড (নিমতলী)
রমনা, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

সম্পাদকীয় পর্ষৎ

সভাপতি	:	অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক
সম্পাদক	:	অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক
সহযোগী সম্পাদক	:	মো. আবদুর রহিম
সদস্য	:	অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
		অধ্যাপক দুলাল ভৌমিক
		অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর

মূল্য	:	২০০.০০ টাকা
Price	:	Tk. 200.00
		US$ 10.00

প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক
		এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

Bangladesh Asiatic Society Patrika (Bengali Journal of the Asiatic Society of Bangladesh) edited by Professor Syed Azizul Huq, published by Professor Sabbir Ahmed, General Secretary, The Asiatic Society of Bangladesh, 5, Old Secretariat Road, Nimtali, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 02-9513783, E-mail : asbpublication@gmail.com

সূচিপত্র

পরিবেশ-নারীবাদ ও 'জয়গুন': একটি পর্যালোচনা
হোসনে আরা ১৬৩

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট
আকলিমা ইসলাম কুহেলী ও প্রিয়াংকা গোপ ১৭৫

উনিশ শতকে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্য: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা
মাহমুদা আক্তার পলি ১৮৭

বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ
সঞ্জয় বিক্রম ২০৩

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে নায়কহীনতা: রাজনৈতিক সূত্র বিচার
মাফরুহা সিফাত ২২৩

কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্প: খাঁটি মানুষের সন্ধান
সুমনা আক্তার ২৪৫

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'সুড়ঙ্গ': জীবনবাস্তবতা–বিন্দুকে ঘিরে বৃত্ত
রীপা রায় ২৬০

গ্রন্থ-পর্যালোচনা

হারুন-অর-রশিদ, *সোহরাওয়ার্দী বনাম বঙ্গবন্ধু*
সাব্বীর আহমেদ ২৭৩

গবেষকদের জ্ঞাতব্য

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় এশিয়ার সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে রচিত মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষকদের জ্ঞাতার্থে পত্রিকায় প্রবন্ধ জমা দেয়ার নিয়মাবলি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এক কপি পাণ্ডুলিপি কম্পিউটার কম্পোজ করে সিডিসহ বা পেন ড্রাইভ-এ জমা দিতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজ করার নিয়ম নিম্নরূপ :

- কম্পিউটার কম্পোজ করার জন্য বাংলা বিজয় সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে (ভারসন বিজয় ৪.০ বা বিজয় ২০০৩)। টাইপ/ ফন্ট SutonnyMJ ব্যবহার করতে হবে।
- কাগজের সাইজ হবে A4। প্রতি পৃষ্ঠায় মার্জিন থাকবে উপরে ২ ইঞ্চি, নিচে ২ ইঞ্চি, ডানে ১ ইঞ্চি এবং বামে ১.৬ ইঞ্চি। প্রবন্ধে গবেষকের পেশাগত পরিচয় ও ঠিকানা থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রবন্ধের সাথে গবেষকের এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে যে :

- জমাকৃত প্রবন্ধের লেখক তিনি;
- এটি একটি মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ;
- প্রবন্ধটি ইতঃপূর্বে অন্য কোনো পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি;
- এই প্রবন্ধে প্রকাশিত মতের সকল দায়িত্ব লেখক বহন করবেন।

৩. প্রকাশের জন্য মনোনীত কিংবা অমনোনীত কোনো পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া হয় না। প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে লেখক পত্রিকার একটি কপি ও প্রবন্ধের ১০ কপি অফপ্রিন্ট বিনা মূল্যে পাবেন।

৪. প্রবন্ধ *প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম* অনুসরণে অথবা *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, *চলন্তিকা* প্রভৃতি অভিধানের প্রথম ভুক্তি (entry) অনুযায়ী রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫. উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন হবে না। গবেষক কোনো বিশেষ বানান-বৈশিষ্ট্য রক্ষায় সচেষ্ট হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা হবে। টীকা ও বক্তব্যের উৎস ও উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করতে হবে। টীকার ক্ষেত্রে শব্দের ওপর সুপারস্ক্রিপ্টে (যেমন বাংলাদেশ[১]) সংখ্যা ব্যবহার করাই নিয়ম। প্রবন্ধের শেষে সংখ্যা অনুসারে টীকা ও তথ্যসূত্র উপস্থাপন করতে হবে।

৬. বক্তব্যের উৎস উল্লেখের ক্ষেত্রে সরাসরি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ-লেখকের নাম, প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে। এশীয়, বিশেষত বাংলা নাম পূর্ণভাবে লেখা যাবে। কিন্তু অন্য নামের ক্ষেত্রে শেষ নাম প্রথমে পদবী ব্যবহার করাতে হবে।

৭. মূলপাঠের মধ্যে উদ্ধৃতি তিন লাইনের বেশি হলে পৃথক অনুচ্ছেদে তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তি-বিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

৮. বই ও পত্রিকার নাম বাঁকা (italics) অক্ষরে হবে (যেমন, বই : *বৃহৎ বঙ্গ;* পত্রিকা : *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*)। মূলপাঠে বিদেশি শব্দ থাকলে তা-ও একই নিয়মে লিখতে হবে। অন্যভাষার শব্দ বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম অনুযায়ী লিখিত হবে। কিন্তু ব্যক্তি ও বইয়ের নাম প্রথমবার উল্লেখের সময় তা প্রথম বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজিতে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের শেষে টীকা (যদি থাকে) এবং টীকার পরে তথ্যনির্দেশ সংযোজিত হবে। প্রত্যেক ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পৃথকভাবে উপস্থাপিত হবে এবং এ উপস্থাপন রীতি হবে বর্ণানুক্রমিক।

১০. প্রবন্ধের সূচনায় একটি সারসংক্ষেপ অবশ্যই দিতে হবে।

১১. যৌথ নামে লিখিত প্রবন্ধ সোসাইটির বাংলা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য গ্রহণ করা হয় না।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ

কাউন্সিল : ২০২০ ও ২০২১

সভাপতি	:	অধ্যাপক মাহফুজা খানম
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক মেসবাহ-উস-সালেহীন অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক অধ্যাপক আহমেদ এ. জামাল
কোষাধ্যক্ষ	:	অধ্যাপক এস এম মাহফুজুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক সাব্বীর আহমেদ
সম্পাদক	:	অধ্যাপক মো. আবদুল করিম
সদস্য	:	অধ্যাপক নাজমা খান মজলিস অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান অধ্যাপক ঈশানী চক্রবর্তী ড. নুসরাত ফাতেমা মিসেস সুরাইয়া আক্তার

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

পরিবেশ-নারীবাদ ও 'জয়গুন': একটি পর্যালোচনা

হোসনে আরা*

সারসংক্ষেপ

আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ-নারীবাদ (Ecofeminism) একইসঙ্গে একটি সামাজিক আন্দোলন, দার্শনিক অবস্থান তথা দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ নীতিবিদ্যার একটি অংশ হিসেবে পরিবেশ- নারীবাদ একইসঙ্গে বৈশ্বিক পরিবেশ ও নারীর প্রতি অবমূল্যায়িত মনোভাবের স্বরূপ উদঘাটন করে। মূলত নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর আধিপত্য বিষয়ক মতামতকে নিয়ে পরিবেশ-নারীবাদ। প্রকৃতির সঙ্গে নারীর একাত্মতা ও ঘনিষ্ঠতা মূল্যায়ন এবং উভয়ের প্রতি বর্তমান সমাজ-কাঠামোর আধিপত্য ও নিপীড়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এর মূল বিষয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করে দেখানো হয়েছে। নারীর রূপ-বর্ণনা, তার দুঃখ বা আবেগ-অনুভূতির প্রকাশে প্রকৃতি অবলম্বকের ভূমিকা পালন করেছে। আধুনিক সাহিত্যেও নারী-চরিত্র, বিশেষত গ্রামীণ নিম্নবর্গের নারী-চরিত্র চিত্রায়ণে প্রকৃতি বিশেষ অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেছে অনেকাংশে। আলোচ্য নিবন্ধে আবু ইসহাকের *সূর্য-দীঘল বাড়ি* উপন্যাসের কেন্দ্রীয়-চরিত্র জয়গুনকে অবলম্বন করা হয়েছে পরিবেশ-নারীবাদ বিশ্লেষণের আধার হিসেবে। প্রকৃতি ও জয়গুনের সাযুজ্য, উভয়ের প্রতি পুরুষতন্ত্রের অবদমন এবং সব ছাপিয়ে উভয়ের অজেয় সত্তাকে উপস্থাপন এ রচনার উদ্দেশ্য।

প্রকৃতি ও মানুষের অন্তরঙ্গ-নিবিড় সম্পর্ক আবহমান কালের। আধুনিক বিশ্বে মানুষ যত বেশি কৃত্রিমতাকে জীবনের সঙ্গে জারিত করেছে, প্রকৃতি থেকে যত বেশি বিযুক্ত হয়েছে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের জন্য প্রকৃতিকে শৃঙ্খলিত করার চেষ্টা করেছে, পরিবেশের ভারসাম্য তত বেশি বিনষ্ট হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে পরিবেশবাদী অন্দোলন বহুকাল আগে থেকেই চলমান। এ ধারার নবতম সংযোজন পরিবেশ-নারীবাদ (Ecofeminism)। প্রকৃতির প্রতি আধুনিক সভ্যতার নিপীড়ন এবং নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য – এ দুইয়ের মধ্যে যে সাযুজ্য তা পরিবেশ-নারীবাদের ভিত্তি।

পরিবেশ-নারীবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি নারীবাদী লেখক Francoise d'Eaubonne. তিনি প্রকৃতি ও নারী উভয়ের উপর পুরুষ-শাসিত সমাজের নিপীড়ন ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশ-নারীবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফ্রাঁসোয়া দ্যুবনের মতকে পরবর্তীকালের তাত্ত্বিকেরা প্রকাশ করেছেন এভাবে –

> what d'Eaubonne was suggesting in the Europe of the 1970s was what others like Rosemary Radford Ruether in New Women/New Earth (1975) were also recognizing as a new way of seeing old problems; the linking of the devaluation of both women and the earth. 'Practically everybody', d'Eaubonne claimed, "knows that today the two most immediate threats to survival are overpopulation and the destruction of our resources; fewer recognize the complete responsibility

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> of the male system, in so far it is male (and not Capitalist or Socialist) in these two dangers; but even fewer still have discovered that each of the two threats is the logical outcome of one of the two parallel discoveries which gave men their power over fifty centuries ago; their ability to plant the seed in the earth as in women, and their participation in the act of reproduction. (cited from T. Gates 1998: 16)[১]

দ্যুবনের মতোই পরিবেশ-নারীবাদীরা পৃথিবীর হিতার্থে পরিবেশ ও নারী তথা অবদমিত প্রান্তসমূহের উৎকর্ষ কামনা করেছেন। ক্যারেন জে. ওয়ারেন, ভেল প্লামউড, মারিই বুকিন, জিম চেনি, বন্দনা শিবা, গ্রেটা গার্দ, মারিয়া মাইজ প্রমুখ পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্নভাবে।

১.২

ক্যারেন জে. ওয়ারেন মনে করেন, পরিবেশ-নারীবাদ অনুসারে নারী ও পরিবেশ অভিন্ন, উভয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামো অনুসারে অধস্তন শ্রেণির। পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো অনুসারে নারী যেহেতু প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন তাই নারী ভৌত জগতের অংশ; পুরুষ অন্যদিকে যেহেতু 'মানুষ' তাই বৌদ্ধিক জগতের অংশ। 'মানুষ' অর্থাৎ পুরুষ হচ্ছে হীনমানের চাইতে শ্রেষ্ঠ, অন্যদিকে নারী যেহেতু হীনমানের প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই নারী হলো পুরুষের অধস্তন। অতএব পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো অনুসারে পুরুষ জাতি নারীর উপর কর্তৃত্ব করবে এ বিষয়টি যৌক্তিকভাবে সমর্থিত।[২]

গ্রেটা গার্দ ও প্যাট্রিক ডি. মার্ফের মতে,

> Ecofeminism is a practical movment for social change arising out of the struggles of women to sustain themselves, their families and their communities. these struggles are waged against the `maldevelopment' and environmental degradation caused by patriarchal societies, multinational corporations and global capitalism.[৩]

মারিয়া মাইজ ও বন্দনা শিবা পরিবেশ-নারীবাদকে আধুনিক তত্ত্ব অভিধায় অভিহিত করতে নারাজ। তাঁরা একে প্রাচীন জ্ঞানের নবতর প্রকাশ বলে অভিহিত করেছেন। 'ecofeminism is really a new term of an ancient wisdom.'[৪]

১.৩

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক বহু পুরাতন। কেবল কৃষিকাজের উদগাতা হিসেবে নয়, প্রাচীন প্রায় সব সভ্যতায় নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেবী অভিধা দেয়া হতো। পুরাণ ও লোককাহিনির পুরাকালে ইতালির বনদেবী ডায়ানার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। বনাঞ্চলের দেবী হিসেবে, বন্য প্রাণীর দেবী হিসেবে, গৃহপালিত পশুপাখির এবং খেতখামারের ফলন দেবী হিসেবেও মানুষের মনে ডায়ানার আসন ছিল শ্রদ্ধাভক্তির।[৫] ডায়ানা ছাড়া নেমির উপবনে আরও ছিলেন ইজেরিয়া; স্বচ্ছ জলের দেবী।[৬] অর্থাৎ প্রকৃতির আরেক উপাদানের দেবী। রোমান দেবী ডায়ানার গ্রিক সংস্করণ হল আর্টেমিস ; সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় দেবী। আর্টেমিস বনের বা বন্য প্রাণীর দেবী হলেও গ্রিক পুরাণে শস্যদেবী হিসেবে অভিহিত করা হয় দিমিতার ও তার কন্যা

পার্সিফোনিকে। দিমিতার শব্দটি এসেছে ক্রিটান শব্দ দিয়াই বা 'বার্লি' থেকে এবং দিমিতার অর্থ বার্লি-মাতা বা শস্য-মাতা।[৭]

দিমিতার ও পার্সিফোনির প্রাচীনতম আখ্যান বর্ণনা করেছেন হোমার তাঁর *দিমিতার বন্দনা* কাব্যে। এ কাহিনিতে মৃত্যুরাজ প্লুটো পার্সিফোনিকে অপহরণ করে পাতালপুরীতে নিয়ে গেলে, কন্যাশোকে মা বিলাপ শুরু করেন; এবং সমস্ত পৃথিবীর শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এ অচলাবস্থার অবসানে দেবতারাজ জিউসের আদেশে প্লুটো তার রানিকে ফিরিয়ে দেয় এ শর্তে যে, বছরের দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে সে মায়ের কাছে এবং বছরের এক তৃতীয়াংশ পাতালপুরীতে তার স্বামীগৃহে। এ কাহিনি রূপকার্থে পৃথিবীতে শস্যের আবর্তনকেই বোঝায়। সে-হিসেবে পার্সিফোনিকে মূলত শস্যের প্রতীক মনে করা হয় – শস্যমাতার কন্যা হিসেবেও তার অবস্থান শস্য বলেই দাঁড়ায়। মানবজীবনে পুনরুজ্জীবনের ধারণাও এসেছে শস্যের আবর্তনকে কেন্দ্র করে; পরিপূর্ণ হয়ে শস্যের ঝরে পড়া, শস্যতরুর মৃত্যু এবং শস্যদানা থেকে পুনরায় সজীব সতেজ গাছের আবির্ভাবের সঙ্গে পুনর্জন্মের ধারণার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

প্রাচীন মিশরে শস্যের দেবী বলা হত আইসিসকে। তাকে বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে; তন্মধ্যে 'সবুজ স্রষ্টা', 'হরিদ্র দেবী যার সবুজ চুলের রং ধরণীর সবুজের মতো।' তিনি আরও হলেন 'রুটির দেবী', 'প্রাচুর্যের দেবী'।[৮]

আমাদের ভারতীয় পুরাণে সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী; তিনি সম্পদ ও অর্থের দেবী নন। লক্ষ্মী সমৃদ্ধি লাভের একটি উপায় হিসেবে ফসল উৎপাদনের কথা বলেছেন। সীতার জন্মকাহিনি বৃহদার্থে শস্য-উৎপাদনের কাহিনি। মহামারি জনিত দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় লক্ষ্মীর পরামর্শে মিথিলার রাজা জনক স্বয়ং চাষের কাজে নিয়োজিত হন এবং লাঙ্গলের ফলায় তুলে আনেন সীতারূপী শস্যকে – পার্সিফোনির মতোই সীতাকেও শস্য প্রতীকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্য সীতাকে কৃষি-সভ্যতার প্রতীক হিসেবেই দেখিয়েছেন।[৯]

যুগ যুগ ধরে পুরাণ, লোককাহিনি ও লোক-মনীষায় নারীর সৃষ্টিক্ষমতাকে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তাকে প্রকৃতির রূপকার্থে দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন মনীষার নবতর প্রকাশে পরিবেশ-নারীবাদের উত্থান, এ কথা খুব অমূলক নয়।

আধুনিক বিশ্বে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে মানব-সভ্যতা নিজেদের জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। বর্তমান বিশ্বের দুর্ভোগের জন্য পরিবেশ-বিপর্যয় অনেকাংশে দায়ী বলে বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেছেন।[১০]

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে উত্থান হয়েছে পরিবেশ নারীবাদের। এ মতবাদের যথাযথ প্রয়োগে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে বলে তাত্ত্বিকেরা মনে করেন। নারীর স্বভাবজ স্নেহমমতা, সহমর্মিতা, যত্ন ইত্যাদি গুণের প্রয়োগে প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করা, মানবজীবন-বান্ধব করে তোলা সম্ভব হতে পারে। তবে পরিবেশ-নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্পষ্ট হয় যে, পরিবেশ-নারীবাদীরা কেবল নারী ও পরিবেশ নিয়ে ভাবে না; বরং তাদের ভাবনায় বৃহত্তর মানব-সমাজ ও সমগ্র পৃথিবীর মঙ্গলকামনা ধ্বনিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ-নারীবাদীরা বিশ্বাস করে, পরিবেশ ও

নারী উভয়ের প্রতি আধিপত্যমূলক আচরণের বা দৃঙ্গিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুনতর বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

২. ১

আবু ইসহাকের (১৯২৬–২০০৩) *সূর্য-দীঘল বাড়ী(১৯৫৫)* উপন্যাস মূলত জয়গুনের আখ্যান। ১৯৪৩-এর মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে দেশবিভাগ ও অব্যবহিত পরবর্তীকালের বাংলার গ্রামীণ মুসলিম জীবনের বিবরণ পাওয়া যায় এ উপন্যাসে জয়গুনের দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে। অনগ্রসর কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ পিতৃপ্রধান সমাজে নারীর প্রান্তিকতা এবং প্রকৃতিকে নেতিবাচক বা ভীতির আধার হিসেবে উপস্থাপন এ উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। অন্যদিকে নারীসুলভ মমতায় প্রকৃতিকে অবলম্বন বা পরিচর্যার ইতিবৃত্তও রক্ষিত হয়েছে এ উপন্যাসে। সব মিলিয়ে পরিবেশ-নারীবাদের চমৎকার প্রতিফলন প্রতিবিম্বিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে জয়গুন চরিত্রের মাধ্যমে।

১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, যা 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে কুখ্যাত হয়ে আছে বাংলার ইতিহাসে। আলোচ্য উপন্যাসের সূচনা এ দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে। বেঁচে থাকার অনন্ত প্রয়াসে গ্রামীণ মানুষেরা প্রকৃতির কোল ছেড়ে শহরের ইট-পাথরের কাঠামোয় খাদ্য খোঁজে, সসন্তান জয়গুনও এ জনস্রোতে সামিল হয়েছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আবার তারা গ্রাম অভিমুখী হয়, বাধ্য হয়ে নয়; অন্তরের নিবিড় তাগিদে। জয়গুনের ভাবনায় গ্রামীণ পরিবেশের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত মনোভাবের স্ফুরণ দেখা যায় এভাবে –

> কতদিন সে নিজের গ্রামে ফিরে আসার তাগিদ অনুভব করেছে, স্বপ্ন দেখেছে। ছায়া-সুনিবিড় একখানি বাড়ী ও একটি খড়োঘর তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে কতদিন।[১১]

এ হাতছানিকে উপেক্ষা করতে না পেরে খাদ্য-সংস্থানের অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও দুই সন্তানসহ গ্রামে ফিরে আসে জয়গুন।

'দুর্ভিক্ষের মহাগ্রাসে' বসতভিটা ও ঘর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়েছিল; তাই নতুন করে সে ঘর বাঁধে পৈতৃকসূত্রে-প্রাপ্ত এক 'ছাড়া ভিটে' 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'তে। শুরুতেই ঔপন্যাসিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন প্রকৃতির নেতিবাচক উপস্থাপনে। গ্রামের বেশিরভাগ বাড়িই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী; পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারী বাড়ি খুবই কম। পূর্ব ও পশ্চিমে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াস্তের দিকাভিমুখী বাড়ি হলে সকালে-বিকেলে সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে হয়। তাছাড়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে সূর্যের কিরণ তীর্যকভাবে এসে পড়ে। সূর্যাভিমুখী হয়ে দৈনন্দিন কাজ-কর্ম করা কষ্টকর, চোখের জন্যেও পীড়াদায়ক। তাছাড়া আরামদায়ক আলো-বাতাস উত্তর-দক্ষিণমুখী বাড়িতেই উপভোগ্য। এ সমস্ত কারণে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পূর্ব-পশ্চিম প্রসারী বাড়ি তৈরি করতেন না। লোকায়ত মনীষার বাস্তব প্রতিফলন এটি। এ জ্ঞান ক্রমে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে নিষেধাজ্ঞা বা 'ট্যাবু' তে পরিণত হয়, কিন্তু মানুষ যখন যুক্তি ছেড়ে যুক্তিহীনতার দিকে অগ্রসর হয় তখন এই 'ট্যাবু' বা লৌকিক সংস্কারই ভীতিকর কুসংস্কারে পরিণত হয়। যে-কারণে আলোচ্য উপন্যাসে সূর্য-দীঘল বাড়ির 'ভীতিজনক' ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় এবং এ ধারণা জন্মায় যে, এ বাড়িতে বাস করলে নির্বংশ হতে হবে –

> এখানে এক সময়ে লোক বাস করত, সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা বংশ রক্ষা করতে পেরেছিল কিনা কেউ জানে না।

> তবুও লোকের ধারণা, সূর্য-দীঘল বাড়ীতে নিশ্চয়ই বংশ লোপ পেয়ে থাকবে। নচেৎ এরকম বিরান পড়ে থাকবে কেন? [১২]

তাদের এ অনুমান-নির্ভর বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা। খাদেম নামক এক ব্যক্তি এ বাড়িতে বসবাস কালে তার একজোড়া ছেলে-মেয়ে পানিতে ডুবে মারা গেলে অন্ধবিশ্বাস ভূমির গভীরে তার শেকড় খুঁজে পায়। তাতে ডালপালা গজিয়ে মহীরুহ হয়ে উঠতে সহায়তা করে গদু প্রধান ও রহমত কাজী অর্থাৎ সমাজের ক্ষমতাবান কিছু মানুষ, যারা তাদের প্রত্যক্ষ অলৌকিক অভিজ্ঞতার বর্ণনে গ্রামীণ মানুষের চেতনার গভীরে ভীতি স্থাপন করে এবং সুযোগ মতো সে ভীতিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারও করে।[১৩] উপন্যাসের শেষাংশে দেখা যায়, জয়গুনকে কবজা করতে না পেরে গদু প্রধান ভূত সেজে উৎপাত শুরু করে এবং জয়গুনকে রক্ষার্থে এগিয়ে আসা করিম বক্‌শকে হত্যা করে গ্রামবাসীর মনে ভূতের ভয়কে আরও দৃঢ় করে তোলে।

দুর্ভিক্ষের সময় বিনাদোষে তালাকপ্রাপ্ত জয়গুনের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে জনশূন্য 'ছাড়া ভিটে' সূর্য-দীঘল বাড়ির এক ধরনের সাযুজ্য রয়েছে। উভয়ের অবস্থান প্রান্তিক এবং আরোপিত নেতিবাচকতায় দুষ্ট। সন্তানসহ টিকে থাকার আদিম প্রয়াসে জয়গুন প্রচলিত ভীতিকে উপেক্ষা করে পরিত্যক্ত এ ভিটায় বসতি গড়ে অসীম সাহসিকতায়। পরম মমতায় সযত্ন পরিচর্যায় বাসযোগ্য করে তোলে বাড়িটিকে।

> সূর্য-দীঘল বাড়ী মানুষের হাত লেগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। জয়গুন ও শফির মা আজেবাজে গাছ-গাছড়া বিক্রি করে টাকার আমদানী করে। তাতে অন্ধকার বাড়ীটায় আলোর আমদানীও হয় বেশ।[১৪]

লক্ষণীয় যে, প্রকৃতির এ পরিচর্যা ঘটেছে নারী-চরিত্রের মাধ্যমে। বরাভয় দেবীর মতোই প্রকৃতিকে ইতিবাচকতায় উপস্থাপনের প্রয়াস দেখা যায় জয়গুনের মধ্যে; যদিও সচেতনভাবে নয়, তবে আদিম মনীষার চিহ্ন নিশ্চয়ই লুকায়িত ছিল নির্জ্ঞান মনের গহন কন্দরে।

২.২

সূর্য-দীঘল বাড়ী উপন্যাসে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবদমন ও নিপীড়নের সমান্তরালে প্রকৃতিকে অবমূল্যায়নের ভাবনাও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। বেঁচে থাকার তাগিদে জয়গুন সামাজিক অনুশাসনের ভীতি অতিক্রম করে জীবিকান্বেষণে সপুত্র ঘরের বাইরে বের হয়। ট্রেনে করে ময়মনসিংহ থেকে সস্তায় চাল এনে বিক্রি করে, সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে ধান ভেনে, বন্য শাক-শাপলা শহরে বিক্রি করে কোনো রকমে তিনটি পেটের ভাত যোগাড় করে সে। কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে, কোনো পুরুষের সাহায্য ছাড়া জয়গুনের স্বাধীন উপার্জন, স্বাবলম্বী জীবন-যাপন স্পর্ধার মতো প্রতিভাত হয় সমাজের কাছে। ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের ঘেরাটোপে জয়গুনের স্বাধীন সত্তাকে বন্দি করতে উদ্যত হয় সমাজপতিরা। মসজিদে জয়গুনের পাঠানো হাঁসের ডিম প্রত্যাখ্যাত হয় 'বেপর্দা আওরাতের চীজ' অভিধায়। ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করায় তার পাঠানো দ্রব্য মসজিদের ইমাম গ্রহণ করেনি, বরং ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তাকে একঘরে করেছে। তবে লোকাপবাদে জয়গুন বিব্রত হয়নি, নিষেধাজ্ঞা মানেনি বরং দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছে–

> খাইট্যা খাইমু। কেওরডা চুরি কইর‍্যাও খাই না, খ'রাত কইর‍্যাও খাই না। কউক না, যার মনে যা।[১৫]

অবশ্য সন্তান-স্নেহের কাছে হার মেনেছে সে একসময়; কন্যা মায়মুনার বিয়ের আসরে গদুপ্রধানের প্ররোচনায় ইমাম বিয়ে পড়াতে অস্বীকৃত হলে বাধ্য হয় সে তওবা করে স্বাধীন জীবিকার্জন ত্যাগ করতে। জয়গুনের প্রতি সমাজের এ আচরণের অন্তরালে কার্যকর থেকেছে নারীর প্রতি পুরুষের তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের অভীপ্সা।

নারীর স্বাধীন অস্তিত্ব যেমন অসহনীয়, প্রচলিত সমাজ তাকে নির্মূল করার জন্য তৎপর; তেমনি অনাদরে বেড়ে ওঠা, দৈনন্দিন জীবনে অকার্যকর উদ্ভিদের স্বকীয় উপস্থিতি সচেতনভাবে মেনে নিতে পারে না এ মানসিকতা। গ্রামে বাঁশঝাড়, তেঁতুল, শিমুল ও গাবগাছ বেশি দেখা যায়; এ গাছগুলো পরিচর্যা ছাড়াই বিনা যত্নে জন্মে ও বেড়ে ওঠে এবং ঝাকড়া হয়ে প্রায়শ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলে তলদেশ। এ কারণে 'গ্রামের লোকের বিশ্বাস – এই গাছগুলোই ভূত- পেত্নীর আড্ডা'[১৬]; গ্রামীণ কোন মানুষই তাদের বসতবাড়িতে এ গাছগুলো লাগায় না কিন্তু দেখা যায় পাখির মাধ্যমে বাহিত বীজে না চাইতেও বাড়ির বা রাস্তার ধারে অনাহূতভাবেই বেড়ে ওঠে এরা। প্রকৃতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারী ও প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকারে অসম্মত, মানুষের আদিম ভয়কে উস্কে দিতে প্রকৃতির সহজাত রূপকে তারা উপস্থাপন করে নেতিবাচকতায়।

২.৩

দুর্ভিক্ষের সময় বিনাদোষে – বলা যেতে পারে খরচ বাঁচাতে বা নিজেকে বাঁচাতে দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃত করিম বক্‌শ তালাক দেয় জয়গুনকে। বংশের বাতি পুত্র কাসুকে রেখে দুই কন্যাসহ পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিতাড়িত করে, পরবর্তীকালে শিশুকন্যার মৃত্যু কিংবা কন্যা মায়মুনার বিয়ে কোনো কিছুই বিচলিত করে না তাকে, কন্যাদের কোনো দায় বহন করে না সে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চরম নিদর্শন করিম বক্‌শ চরিত্রটি। দুর্দান্ত মেজাজের কারণে শত্রু-সঙ্কুল প্রতিবেশে লাঠি নিয়ে চলাফেরা করত সে। রাতে দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় লাঠির আঘাতে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী মেহেরনকে হত্যা করে গলায় রশি বেঁধে গাবগাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আত্মহত্যা বলে প্রচার করে এবং হাজার টাকা খরচ করে নিজেকে আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখেছিল। দ্বিতীয় স্ত্রী জয়গুনের 'ওপরও তার বাহুবলের কসরত চলে ছয় বছর। তার শরীরের কোনো অঙ্গ বোধ হয় তার প্রহারের কাছে রেহাই পায়নি।'[১৭] জয়গুন প্রতিবাদ করেনি, নীরবে-নিভৃতে সব অত্যাচার সহ্য করেছে । মুসলমান ঘরের বউ হিসেবে নানা কাহিনি-উপকাহিনি এবং ধর্মীয় বৃত্তান্তে স্বামীর নিপীড়নকে স্বাভাবিক বলে ঘোষণার তথ্য সে জেনেছে শৈশব থেকেই। তার শাশুড়িও পুত্রের আচরণকে সমর্থন করে সান্ত্বনা জুগিয়েছে পুত্রবধূকে – 'ওয়াতে কি অইছে বউ। মরদগুনে যেই পিডে মারব, হেই পিড বিস্তে যাইব। যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব।'[১৮] নারী হলেও এ চরিত্র পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক। জয়গুনের শাশুড়ির মতো একই অবস্থান দেখা যায় মায়মুনার শাশুড়ির ক্ষেত্রেও। সে কঠোরভাবে স্বামী-পুত্রের নিষ্ক্রিয় অবস্থানের বিপরীতে গিয়ে মায়মুনার গহনা খুলে রেখে তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কেননা তার পুত্রের ঘর-গেরস্থালি করবার জন্য মায়মুনার বয়স খুবই অল্প – কেবল এই দোষে সে যেমন নির্মম হয়েছে তার পুত্রবধূর প্রতি। তার নিপীড়ক অবস্থান তাকে পুরুষতন্ত্রের সহযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বলা হয়ে থাকে,

'নারীরাই নারীর শত্রু' অথবা শাশুড়ি একসময় বধূ হিসেবে যে নির্যাতন ভোগ করেছে, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটায় সে নিজে যখন পরিবর্তিত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ নিজে শাশুড়ি হয়। এ বিষয়ে গূঢ় তর্কে না গিয়ে, জয়গুন ও মায়মুনা – উভয়ের শাশুড়িদ্বয়ের আচরণের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাদের পরিবর্তিত মনোভাব অবদমিত ক্রোধ বা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নয় বরং নিজ সংসার বা সন্তানকে রক্ষাকল্পে এমন ভূমিকায় তারা অবতীর্ণ হয়।

সর্বংসহা প্রকৃতির মতো শত অত্যাচার সহ্য করেও করিম বক্‌শের ঘর করতে পারেনি জয়গুন। দুর্ভিক্ষের সময় তার ও তার সন্তানদের ভাত-কাপড়ের দায় নিতে চায়নি, মানবিকতা ও বিবেকশূন্য হয়ে কন্যাসহ স্ত্রীকে বিনাকারণে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে করিম বক্‌শ; সমাজ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি; বাতাসের প্রবাহের মতোই স্বাভাবিক প্রতিভাত হয়েছে তা। বরং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জয়গুনকে পুনরায় বিয়ে করা সহজ হয় না ; কেননা শরিয়ত মতে, অন্যজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে তালাকপ্রাপ্ত হলেই কেবল পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিয়ে করা যায়। করিম তাতে অরাজি না হলেও জয়গুন বিরোধিতা করে প্রবলভাবে, জোরালোকণ্ঠে উচ্চারণ করে – 'যেই থুক একবার মাডিতে ফালাইছি, তা মোখ দিয়া চাট্‌তে পারতাম না।'[১৯] তিন কানি জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার লোভাতুর প্রস্তাবেও সায় দেয় না সে বরং প্রত্যাখ্যানের পুনরাবৃত্তি বজায় রাখে।

করিম বক্‌শের নিপীড়ক চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য যে কেবল স্ত্রীর উপর প্রদর্শিত হয়েছে তা নয়, কোঁচ দিয়ে মাছ বিদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তার যে উল্লাস তাতে প্রকৃতির প্রতিও তার পাশবিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট। ঔপন্যাসিক এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন এভাবে – 'তার যৌবনের হিংস্র স্বভাবের অবশিষ্ট এই মাছ শিকার।'[২০]

২.৪

স্বামী-পরিত্যক্ত জয়গুনের স্বনির্ভর জীবনযাত্রা অবশ্য নির্বিঘ্ন ছিল না কখনোই। তার মানবেতর জীবন-যাপনও ছিল নানা প্রতিকূলতা ও বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন। গ্রাম্য-ফকির জোবেদ আলী থেকে শুরু করে সমাজপতি গদু-প্রধান সবার আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত হয় সে। তিরিশের কোঠায় বয়স এবং একাধিক সন্তান থাকা সত্ত্বেও তার সুগঠিত দৈহিক অবয়ব এবং 'গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা'[২১] পেটে ধরার সক্ষমতা তাকে প্রার্থিত করে তোলে সব শ্রেণির পুরুষের কাছে। জয়গুন অবশ্য আর পরমুখাপেক্ষী হতে পছন্দ করে না। ফকির জোবেদ আলীকে সে বিতাড়িত করে বাড়ি থেকে, 'দুকানি জমি আর একখান ঘরে'র বিনিময়ে গ্রাম্য-সমাজপতি গদু প্রধানের চার নম্বর স্ত্রী হবার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে সে অসীম দৃঢ়তায়। নিজ সন্তানদের ভবিষ্যতের ভাবনা তার কাছে প্রাধান্য পায়। অমানুষিক পরিশ্রম করে দুবেলা পেটভরে খেতে না পেলেও ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছে সে পরম মমতায়। গদু প্রধানের ঘরণি হয়ে তার বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পরগাছা করে তুলতে অনিচ্ছুক সে তাই। গদু প্রধান তাদের আশ্রয় দেবার অঙ্গীকার করলেও তাতে বিশ্বাসস্থাপনে সায় দেয় না জয়গুনের মন। অবশ্য গ্রামের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সমাজপতিকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফলও ভোগ করতে হয় তাকে। প্রথমে তওবা করে বাইরে কাজ করা ছাড়তে হয় এবং সবশেষে সূর্য-দীঘল বাড়ির কল্পিত ভূতের হাতে করিম বক্‌শের মৃত্যু হলে বাড়ি তথা গ্রাম ছাড়তে হয় জয়গুনকে।

জীবন-ধারণের অমিত প্রত্যয়ে জয়গুন সমগ্র সমাজের বিপরীতে অবস্থান করেছে। বারবার ভেঙেছে ধর্মীয় তথা সামাজিক নিয়ম, প্রতিপক্ষ করে তুলেছে সমাজকে, মিত্র তার কেউ নেই - কোনো অবলম্বন ছাড়াই মুখোমুখি সংগ্রাম করেছে সে সমাজপতিদের সঙ্গে। সমালোচকের মতে, 'নিজের স্বাধীন সত্তার বিকাশে ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে অন্তরের শক্তি ছাড়া জয়গুনের আর কোন অবলম্বন নেই।'[২২]

২.৫

প্রকৃতির মতোই শাশ্বত, কল্যাণময়ী জয়গুন। নিজ সন্তানের প্রতি তো বটেই, অন্যের সন্তানের প্রতিও তার মমতার ফল্গুধারা প্রবহমান। ঈদের দিন সামান্য মিষ্টান্ন রান্না করলেও নিজে খায় না বা নিজ সন্তানদের সবটুকু খেতে দেয় না; শফির জন্য তুলে রাখে। নিজেরা ঠিকমতো খেতে না পারলেও শফিদের ঘরে রান্না হয়েছে কি না তার খোঁজ-খবর রাখে নিয়মিত। নিজেদের কোনো জমি না থাকলেও অন্যের জমির ফসলে চোখ জুড়ায় তার। ধানের অধিক ফলনে তার কণ্ঠে সন্তুষ্টির সুর ধ্বনিত হয়; অসময়ের বৃষ্টিতে ধান বিনষ্ট হবে – এ ভাবনায় কাতর হয়। অন্যের জমির ফসলের উপর দিয়ে নৌকা চালানোর অপরাধে তিরস্কার করে সে শফিকে।

> শফির হাতে লগি। সে একটা ধান-খেতের ভেতর কোষা চালাতেই জয়গুন বাধা দেয় – এই কি করস, শফি ? এমন ভরা খেতের মইদ্যে দিয়া নাও বাইতে আছে ?
> – ক্যান ? এইডা তো আর আমাগ খেত না।
> – অলক্ষ্মী ছেঁড়ার কথা হোন। আমাগ খেত নাই বুইল্যা তুই অমন ফুলে ভরা ধানের উপর দিয়া কোষা চালাবি ? যা খাইয়া মানুষ বাঁচে, হেইয়া লইয়া খেলা! খেতের আইল দিয়া যা।
> – আইল দিয়া গেলে কিন্তুক দেরী অইব।
> – অউক দেরী। ধানের ছড়া বাইর অইছে। খেতের মাঝ দিয়া আর যাওন যাইব না। এট্টু টোক্কা লাগলেই কাইত অইয়া পড়ব, আর মাথা খাড়া করতে পারবো না। [২৩]

মানবিকতায় উজ্জ্বল জয়গুনের প্রকৃতির প্রতি নিবিড় অনুভবের ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে রয়েছে এ উপন্যাসের বহু বর্ণনাতে। গ্রামীণ জীবনের বহু বিধি-নিষেধ সে পালন করে প্রথাগতভাবে – যা প্রকৃতির জন্য মঙ্গলজনক। তার ভাবনায়– 'বাচ্চা-কাচ্চার মা, রাত-বিরাতে গাছের ফল-পাতা ছিঁড়তে নেই।'[২৪] এ নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবুকে কুসংস্কার বলা যাবে না, বরং উদ্ভিদের জন্য তা যথেষ্ট উপকারী। রাতের বেলার শ্বসন-কাজে পাতা বৃক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ ভাবনা জয়গুনের নিজস্ব নয়, যুগ যুগ ধরে গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত লোকায়ত জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এ ধরনের বিধি-নিষেধের মাধ্যমে এবং এর স্রষ্টা, ধারক ও বাহক মূলত নারীসমাজ। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের মতে, সমাজ-বিকাশের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক নানা রকম সংস্কার, প্রথা এবং আইনের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে এসব বিধি-নিষেধ।[২৫] জয়গুন চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক প্রকৃতি-বিষয়ক গ্রামীণ নারী-মনীষার প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

জয়গুনের সমগ্র জীবনাখ্যানে প্রকৃতি-নির্ভরতার বিবরণ স্পষ্ট। সূর্য-দীঘল বাড়িতে বসতি গড়ে তুলতে সেখানে অযত্নে বেড়ে ওঠা বেশ কিছু গাছ বিক্রি করে সে অর্থের সংস্থান করেছে; তাতে অবশ্য প্রকৃতির বিনষ্টি ঘটেনি বরং ঘন হয়ে জন্মে থাকা গাছের চাপ কমাতে অন্য গাছগুলো পর্যাপ্ত আলোবাতাস পেয়েছে।

জয়গুনের জীবিকার্জনেও প্রকৃতি-নির্ভরতা স্পষ্ট। সে অন্য জেলা থেকে সস্তায় চাল এনে বিক্রি করে; অর্থাৎ শস্যদানা তার জীবিকার্জনের অবলম্বন। হাঁস প্রতিপালনে কোনো খরচ নেই বলে সে হাঁস পালে বাড়িতে। তার অভাব-নিরন্ন সংসারে হাঁস একটি অবলম্বন। হাঁসের ডিম ও বৃহৎ জরুরি প্রয়োজনে হাঁস বিক্রি করে সে অর্থের জোগাড় করে।

২.৬

প্রকৃতি-জারিত জয়গুনদের জীবনে প্রকৃতির কোনো কোনো উপাদান তাদের জীবনে আশা-ভরসা জাগায় বা ভবিষ্যত বিপর্যয়ের ইঙ্গিত বহন করে। প্রকৃতপক্ষে গ্রামীণ-জীবনের প্রতিটি প্রান্তই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং জীবনযাপনের সব উপকরণ সংগ্রহ করে তারা প্রকৃতি থেকে। পরম আকাঙ্ক্ষিত ঈদের চাঁদের গঠন বা অবস্থানে খোঁজে তারা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত । ঈদের চাঁদ বাঁকা না হয়ে সোজা হয়ে ওঠায় খুশি হয় শফির মা এবং ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, এবার আর আকাল (দুর্ভিক্ষ) হবে না।

> শফির মা বলে – হেই আকালের বচ্ছর পঞ্চাশ সনে দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ঈদের চান উঠছিল।...
> – দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া ওঠলে আকাল অইবই। বুড়া-বুড়ীর কাছে হুনছি, দক্ষিণ মুহি কাইত অইয়া চান যদি সমুদ্দুরের ওপরে নজর দেয়, তয় বান ডাইক্যা দ্যাশ-দুইন্নাই তলাইয়া যায়।[২৬]

শুধু তাই নয়, চাঁদের উত্তরমুখী অবস্থানে মড়ক লাগে, কলেরা-বসন্তের মতো মহামারিতে বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। লক্ষণীয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী করছে একজন বর্ষীয়ান নারী শফির মা এবং এ জ্ঞান বা তথ্য সে বিতরণ করছে নতুন প্রজন্মের নারী-প্রতিনিধি মায়মুনাকে। এভাবে লোকায়ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞা হস্তান্তরিত হচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এবং প্রকৃতি-দর্শনে লোকজীবনের নানান প্রান্ত উন্মোচিত হচ্ছে।

কেবল ঈদের চাঁদ নয়, জয়গুনের অপ্রতিরোধ্য জীবন-যুদ্ধে সূর্য-দীঘল বাড়ির সুপ্রাচীন তালগাছটি নতুন পথে চলার অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দেয়। আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্রের হুকুম অমান্য করে ছেলেমেয়েদের জীবন রক্ষার্থে জয়গুন তওবার বন্ধন ছিন্ন করে ধানকলে কাজ করতে যায়। জীবিকার্জনের পথ রুদ্ধ করে জয়গুনকে কোণঠাসা করার জন্য গদু প্রধান যে ভূমিকা নেয় তাতে সন্তানদের প্রাণ বাঁচাতে সূর্য-দীঘল বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয় জয়গুন। খোদার ওপর ভরসা করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই তারা আবার পথে নামে। তাদের পথযাত্রায় 'অনেক কালের অনেক ঘটনার নীরব সাক্ষী'[২৮] উঁচু তালগাছটি অনুপ্রেরণা হয় তাদের এগিয়ে চলার।

৩.১

আবু ইসহাক *সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে জয়গুন ও প্রকৃতির প্রান্তিকতাকে একই সমান্তরালে প্রকাশ করেছেন। দুর্ভিক্ষ-তাড়িত, স্বামী-পরিত্যক্ত, সহায়-সম্বল-স্বজনহীন জয়গুন ও মানুষের পদচারণা-বর্জিত ভীতি ও নেতিবাচকতায় জারিত সূর্য-দীঘল বাড়ির সামাজিক অবস্থান প্রায় একই – কারোই গ্রহণযোগ্যতা নেই প্রথাগত সমাজ-কাঠামোয়। নারী হয়েও জয়গুনের উপার্জন-সক্ষমতা এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীন-সত্তার স্ফুরণ এবং অন্যসব বাড়ির মতো উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী না হয়ে বিপরীতে পূর্ব-পশ্চিমে দীঘল হওয়া বাড়ি – উভয়ই প্রচলিত সমাজ-কাঠামোর ছককে

ভেঙে দিয়েছে। প্রতিকূলতার অভিযাত্রিক এই নারী ও বাড়ি অর্থাৎ প্রকৃতির অপরাজেয় ও সর্বসংহা সত্তা উপজীব্য হয়েছে এ উপন্যাসে।

অন্তিমে জয়গুনকে ছাড়তে হয়েছে এ বাড়ি; নতুন করে ভূতগ্রস্ত হওয়ার অপবাদে এ বাড়ি আবারও জনশূন্য হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এ তাদের পরাজয় মনে হলেও ঔপন্যাসিক উভয়ের অপরাজেয় সত্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন স্পষ্টভাবে। সব অপবাদকে তুচ্ছ করে এ বাড়ির তালগাছটি সগর্বে মাথা উঁচু করে হাতছানি দেয় জয়গুনদের এবং সপরিবারে জয়গুন এগিয়ে চলে নতুন জীবনের পথে। উপন্যাসের শুরু ও শেষ উভয় প্রান্তেই নারী ও প্রকৃতির সাযুজ্য স্থাপিত হয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যবাদ ও নিপীড়নের শিকার হয়ে। নারী ও প্রকৃতি তথা পরিবেশ একাত্ম হয়েছে সামগ্রিকভাবে এ উপন্যাসে।

পরিবেশ-নারীবাদের উত্থান আশির দশকে, তারও দুই-দশক পূর্বে আবু ইসহাক রচনা করেছেন আলোচ্য উপন্যাসটি। কিন্তু নারী ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তো আদিম কালের । সামাজিক ইতিহাস এবং সাহিত্য প্রাচীনকাল থেকেই এ সম্পর্কের নিবিড়তা, মাধুর্যকে ধারণ করেছে সরবে। আধুনিক সাহিত্যে এ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে উভয়ের প্রতি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক আচরণের মানদণ্ডে। এ উপন্যাসেও তার শৈল্পিক উপস্থাপন ঘটেছে সাবলীল ও জোরালোভাবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Barbara T. Gates, "A Root of Ecofeminism: Ecofeminisme", *Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy,* Ed. Greta Gaard & Patrick D. Murphy, University of Illionois Press, USA, 1998, p.16.

২. রাশিদা আখতার খানম, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৫৮-৫৯

৩. Greta Gaard and Patrick D. Murphy (Ed.), *Ecofeminist Literary Criticism : Theory, Interpretation, Pedagogy* , University of Illionois Press, USA, 1998, Introduction, p. 2.

৪. Maria Mies and Vandana Shiva, *Ecofeminism*, Zed Books Ltd, London, UK and New York, USA, 1993, p. 13

৫. স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার (খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত), *গোল্ডেন বাউ; মানুষের জাদুবিশ্বাস ও ধর্মাচার বৃত্তান্ত*, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর পাবলিশিং লিমিটেড (বিপিএল), ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৯

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

৯. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গোরু তখন ধন বলিয়া এবং কৃষি পবিত্রকর্মরূপে গণ্য হইত। জনক স্বহস্তে চাষ করিয়াছেন। এই চাষের লাঙল দিয়াই তখন আর্যেরা ভারতবর্ষের মাটিকে ক্রমশ আপন করিয়া লইতেছিলেন। এই লাঙলের মুখে অরণ্য হঠিয়া গিয়া কৃষিক্ষেত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। রাক্ষসেরা এই ব্যাপ্তির অন্তরায় ছিল।

প্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে জনক যে আর্যসভ্যতার একজন ধুরন্ধর ছিলেন নানা জনপ্রবাদে সে কথার সমর্থন করে। ভারতবর্ষে কৃষিবিস্তারে তিনি একজন উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কন্যারও নাম রাখিয়াছিলেন সীতা। পণ করিয়াছিলেন, যে বীর ধনুক ভাঙিয়া অসামান্য বলের পরিচয় দিবে তাহাকেই কন্যা দিবেন। সেই অশান্তির দিনে এইরূপ অসামান্য বলিষ্ঠপুরুষের জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যে লোক দাঁড়াইতে

পারিবে তাহাকে বাছিয়া লইবার এই এক উপায় ছিল।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্য-সৃষ্টি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৬৬১-৬৬২)

এ মন্তব্যে পক্ষান্তরে সীতাকে কৃষির সঙ্গে তুলনা করা হয়, যার বিস্তার বা রক্ষার ভার দেয়া হয় রামচন্দ্রের মতো বীরকে; যে রাক্ষসদের পরাজিত করে কৃষিসভ্যতার বিস্তার ঘটাতে পারবে।

১০. *দ্য গার্ডিয়ান*-এর এক বিশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়, গবেষকেরা বলেছেন, বনাঞ্চল বিনষ্ট করা ও বন্য প্রাণী শিকারের ফলে প্রাণী ও তাদের বহন করা জীবাণু ক্রমাগতভাবে মানুষ ও গবাদিপশুর সংস্পর্শে চলে আসছে। নতুন সংক্রামক রোগের প্রায় ৭০ শতাংশ বিভিন্ন প্রাণী থেকে উৎপত্তি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কোভিড-১৯, সার্স, বার্ড ফ্লু, ইবোলা, এইচআইভি প্রভৃতি।

(প্রথম আলো, সোমবার, ৭ জুন ২০২১ তারিখে প্রকাশিত "মহামারির মূল কারণ প্রকৃতির বিনাশ" শীর্ষক রচনা থেকে গৃহীত।)

১১. আবু ইসহাক, *সূর্য-দীঘল বাড়ি*, নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৯

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৩. হোসনে আরা, "সূর্য-দীঘল বাড়ী: অপরাজেয় জীবনালেখ্য", 'সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ১-২, ফাল্গুন ১৪১৭, ফেব্রুয়ারি ২০১১, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৬১

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

২১. মহীবুল আজিজ, *বাংলাদেশের উপন্যাসে গ্রামীণ নিম্নবর্গ*, জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৫৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৪. সিগমুন্ড ফ্রয়েড (জেম্‌স্ স্ট্যাচি অনূদিত), *টোটেম এ্যান্ড ট্যাবু*, রাটলেজ এ্যান্ড কেগান পল, লন্ডন, ১৯৫০, পৃ. ২৪

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

আকলিমা ইসলাম কুহেলী*
প্রিয়াংকা গোপ**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা থাকলেও সেইভাবে কখনোই স্বতন্ত্র সংগীত ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, ফলে কোন নিজস্ব ঘরানাও গড়ে ওঠেনি। কেননা এদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, প্রচারের অভাব। সংগীতকে পেশা হিসেবে নিলে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করাও কঠিন। আর শিল্প চর্চার পাশাপাশি অন্য কোন কাজ করলে সেখানে প্রকৃত শিল্পের চর্চা ব্যাহত হয়। এছাড়া শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতার আরেকটি মূল কারণ হলো– এদেশ কৃষিনির্ভর, অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, কাজ শেষে তাদের বিনোদন ভালো লাগে কিন্তু দীর্ঘক্ষণ ধরে শিল্পের রসাস্বাদন সম্ভব নয়। যে কয়েকজন রসিক বা বোদ্ধা শ্রোতা রয়েছেন, সঠিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাদের জন্যও অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তীসময়ে একটা শিল্পী শূন্যতা তৈরি হয়। কিন্তু তারপরেও থেমে নেই, বাংলাদেশে প্রাণের তাগিদে যাঁর যতটুকু সামর্থ্য আছে, তাই নিয়ে এগিয়ে চলছে। ফলে শাস্ত্রীয় সংগীত এখন আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন গুণী শিল্পীর পুণ্যভূমি আবার সুরে সুরে ভরে উঠবে, অল্পবিস্তর অসংগতিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে।

সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হচ্ছে সংগীত। সংগীত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কালের বিবর্তনে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রার যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সংস্কৃতিও নব নব সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষত শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু রাগসংগীত চর্চা গুরু-শিষ্য পরম্পরা নির্ভর; তাই পূর্বে যে সকল রাগ-রাগিণী গীত হতো, বর্তমানকালে এর গায়নশৈলীর রূপ পরিবর্তিত হলেও সেইসকল রাগরাগিনীই প্রচলিত আছে। প্রাচীন লেখ্যরূপ চর্যাগীতিও রাগরাগিণীর ওপর নিবদ্ধ। যদিও চর্যাগীতির গায়নকৌশল ও রাগরাগিণী মূল ধারার শাস্ত্রীয় সংগীতের সাথে মেলে না, তবুও চর্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাগরাগিণীর উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাভাষী অঞ্চলগুলোতে হাজার বছর আগেও রাগসংগীতের চর্চা ছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এদেশের সংস্কৃতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলাদেশ ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অংশ ছিল, এরপর ভারত-পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ রয়ে যায়, যার নাম হয় প্রথমে পূর্ব বাংলা, পরে পূর্ব পাকিস্তান। সেই সময়ের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কারণে অনেক সংগীতজ্ঞ ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক রাজা ও জমিদার এ দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় একপ্রকার সাংগীতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। পরাধীন বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে

* সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
** সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে স্বাধীনতা লাভ করে, জন্ম লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ– বাংলাদেশ। বাংলাদেশ স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ধীরে ধীরে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং শুরু হয় শাস্ত্রীয় সংগীতের পথচলা।

বাংলাদেশ তার নিজস্ব সুর অর্থাৎ লোকসুরবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

> বাংলাদেশ নদীমাতৃক বলে বাংলা লোকসংগীতে ভাটিয়ালি সুরের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক দেশের জাতীয় চরিত্র যেমন তার নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে আশ্রয় করে গড়ে উঠে, তেমনি লোকসংগীতও প্রধানত দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশের প্রকৃতি সকল অঞ্চলে এক নয়; কোথাও নদীবিধৌত, কোথাও অরণ্যাকীর্ণ; আবার কোথাও নীরস প্রস্তরভূমি, কোথাওবা তরাই অঞ্চল। এসব কারণে লোকসংগীতের সুর সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করলেও তা মুখ্যত আঞ্চলিক; যেমন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া, পূর্বাঞ্চলের ভাটিয়ালি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বাউল-মারফতি ইত্যাদি। আবার বাংলাদেশ নদীমাতৃক হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের নদ-নদীর প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে; পদ্মা, মেঘনা, সুরমা ও ধলেশ্বরীর যে রূপ, মধুমতি, ইছামতি, ভৈরব প্রভৃতির রূপ তা থেকে ভিন্ন। সুতরাং নদ-নদীর সঙ্গে নানাভাবে জনসমাজের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তা বাংলাদেশের সর্বত্র এক রকম নয়। এ কারণে যে অঞ্চলের জীবনধারা যেভাবে গড়ে উঠেছে, সে অঞ্চলের লোকসংগীতও সেভাবেই সৃষ্টি ও বিকশিত হয়েছে।[১]

কিন্তু শাস্ত্রীয় সংগীতের কোন স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে ওঠেনি। সেই অর্থে শাস্ত্রীয় সংগীতের পেশাদার কোন শিক্ষক বা শিল্পী ছিলেন না, যাঁরা সামনের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। যাঁরা চর্চা করতেন তাঁরা ভালোলাগার টানে করতেন, সেই অর্থে কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না এবং দরিদ্রতার সাথেই দিন যাপন করতেন। ফলে বাংলাদেশের কোন অঞ্চল শাস্ত্রীয় সংগীতের ভিত্তিভূমি হিসেবে গড়ে ওঠেনি। যার প্রভাব পড়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পীই খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর ছিল। যারা সংগীত ভালোবাসতেন বা চর্চা করতেন তাদের অনেকেরই সঠিক গুরুর অভাবে গান শেখার ইতি টানতে হয়েছিল। বেশি আগ্রহীরা ভারতে গিয়ে গান শিখতেন, এর মধ্যে তো কেউ কেউ ওখানে থেকেও গিয়েছিলেন, তবে পাকিস্তানে ভালো ওস্তাদ থাকলেও সেখানে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বিধি নিষেধ ছিল, এছাড়া সবার মনে পাকিস্তান-বিদ্বেষ তৈরি হওয়ায় কেউ আগ্রহীও ছিলেন না। ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশও একটি অঞ্চল। অত্র উপমহাদেশের অধিকাংশ সংগীতেই উত্তর ভারতীয় সুরের প্রভাব দেখা যায়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনলে– বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার ইতিহাস ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার ইতিহাসেরই সমসাময়িক। ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলাদেশের সাহিত্য, কাব্য, সংগীতের জন্য নবজাগরণের সময়। সমগ্র সংগীতেই নতুন ভাবনা-চিন্তা, নতুন সংযোজন লক্ষ করার মতো ছিল। বিশেষ করে বাংলা গান এক নতুনত্বের সাথে বাঙালিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) গান উল্লেখযোগ্য। এই পঞ্চগীতিকার কবি তাঁদের গানে সার্থকভাবে রাগ-রাগিণীর ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীত রচনা করেছেন ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুংরি, তারানা ভেঙে। অন্যদিকে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর সুরকে সাজিয়েছেন খেয়াল, ঠুংরি ও গজলকে অবলম্বন করে। কাজী নজরুল ইসলামের গানে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, কাজরী, সাদরা-দাদরা, তারানা প্রভৃতি রাগসংগীতের সকল ধারার সম্মিলন লক্ষ করা যায়। তিনি যেমন প্রাচীন ও

লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীকে উদ্ভাবন করেছেন তেমনি আবার সৃষ্টি করেছেন নতুন রাগ-রাগিণী। রাগ সংগীতে নতুন নতুন তাল ও ছন্দের সমাহারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সংগীতকে করেছেন অনেক সমৃদ্ধ। বাংলা গানে এই প্রভাব শাস্ত্রীয় সংগীতকেও সমানভাবে প্রভাবিত করায় তা কঠোর নিয়ম থেকে একটু একটু করে স্বাধীন হচ্ছিল। তবে সেইসময় অবিভক্ত বাংলায় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা বলতে ধ্রুপদের চর্চাই বেশি হতো। পরবর্তীকালে উপর্যুক্ত গীতিকবি ও সুরকারদের হাত ধরে ধীরে ধীরে শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যান্য ধারার স্বাদ নিতে বাঙালিরা খেয়াল, ঠুংরির চর্চা শুরু করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণে, যেসব নব নব ভাবনা ও প্রয়াস সংগীতের ক্ষেত্রে ঘটেছিল রাগসংগীত ও বাংলা সংগীতের বিকাশ সাধনে তার একটি সংক্ষিপ্ত উদ্যোগচিত্র এখানে পেশ করছি। এই পর্বের সাংগীতিক প্রয়াসগুলি ছিল প্রধানতঃ

১। নতুন যুগের ভাবানুযায়ী গীত রচনা এবং সেই গানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ গীত রীতির অনুসরণ। এই প্রচেষ্টা থেকেই মুখ্যত ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির প্রবর্তন ও ক্রমোত্তরণ।

২। সাধারণ মানুষের মনে সংগীত সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগীত সংক্রান্ত প্রচার-প্রসারে সংগীত সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ।

৩। সংস্কৃত, ফার্সি ভাষায় রচিত সংগীতবিষয়ক কোষ গ্রন্থসমূহের বাংলা অনুবাদ, সংগীত সংক্রান্ত নতুন গ্রন্থ রচনা এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্য তথা আন্তর্জাতিক সংগীতের ইতিহাস প্রণয়ন।

৪। সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে তরুণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান, স্বদেশে সংগীতের মানোন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সংগীত উন্নয়নী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

৫। প্রাচীন গীতিকার ও সংগীতকারের জীবনী রচনা ও গীত সংকলন সম্পাদনার সাহায্যে দেশের প্রবহমান গানের সঙ্গে নবীন সংগীতানুরাগীদেও সেতুবন্ধন।

৬। শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রবাদনের কালানুক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ বাংলায় ও ইংরেজি ভাষায় রচনা করে বিশ্বসভায় এই উপমহাদেশীয় সংগীতের বহু শতাব্দীবাহিত ঐতিহ্যের পরিচয় প্রদান।

৭। দেশ-বিদেশে প্রচলিত নানা রকমের স্বরলিপি পদ্ধতির সারাৎসার করে সর্বজনবোধ্য একটি স্বরলিপি পদ্ধতি প্রণয়ন এবং তার সহায়তায় রাগসংগীত ও বাংলা সংগীতের প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ।

৮। হার্মনি, অর্কেস্ট্রা, অপেরা, কাউন্টার পয়েন্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুরবৈশিষ্ট্য বা গীতরীতি রাগসংগীত, বাংলা সংগীতে (কণ্ঠ ও বাদ্য) গ্রহণ ও ভাব প্রকাশের নতুন উপাদানরূপে ব্যবহার।

৯। সংগীত সভা, সংগীত সম্মেলন (Conference) প্রভৃতির আয়োজন ও কার্যক্রম। সারা ঊনবিংশ শতকব্যাপী উল্লিখিত সাংগীতিক প্রয়াসগুণ প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে, বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে বাংলায় (অবিভক্ত বাংলা) রাগসংগীত ব্যাপকভাবে চর্চিত হল এবং বাংলা সংগীতও বিষয়বৈচিত্র্য আর সুরবৈচিত্র্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করল। এই সময়কালে রাগসংগীতের চর্চা বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হল। বাঙালির রাগসংগীত চর্চার আগ্রহ-অনুরাগ লক্ষ করা গেল কি কণ্ঠসংগীত কি যন্ত্রসংগীতে– উভয়তই গায়ক-গায়িকা হবার প্রবল আবেগ, নিষ্ঠা, অনুশীলন ও সাধনায় ক্রমে রাগসংগীতের ইতিহাসে বাঙালি গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও অবদান রেখেছে।[২]

বাংলাদেশে আলাদা করে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল এমনটা বলা কঠিন। তখন কলকাতায় অবাধ যাতায়াতের সুবিধা ছিল বিধায় কলকাতায় শাস্ত্রীয় সংগীতের বিবর্তন বাংলাদেশেও প্রভাব ফেলেছে। "বিষ্ণুপুর তথা বাংলাদেশের আলোচ্যকালে রামশংকরকেই (১৭৬১-১৮৫৩) আদি ধ্রুপদ-গুণী রূপে পাওয়া যায় এবং তাঁর কৃতী শিষ্যমণ্ডলীর ধারায় ধ্রুপদ সঙ্গীত-চর্চা বিস্তৃত হয়।"[৩] পণ্ডিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের হাত ধরে বাংলায় (পশ্চিমবঙ্গে) একটি স্বতন্ত্র ধ্রুপদ ঘরানা গড়ে উঠলেও খেয়াল বা ঠুংরির স্বতন্ত্র ঘরানা গড়ে ওঠেনি।

এই ঘরানা পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় একে বিষ্ণুপুর ঘরানা নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তানসেনের (১৫০৬-১৫৮৯) পুত্র বংশীয় রবাব বাদক ও ধ্রুপদীয়া ওস্তাদ কাশেম আলী খাঁ (১৯২৮-১৯৮৪) বিষ্ণুপুরে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর কিছু শিষ্যও তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে ত্রিপুরায় মহারাজ বীরচন্দ্রের (১৮৩৯-১৮৯৬) দরবারে ওস্তাদ কাশেম আলীর সাথে বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া যদুভট্টের (১৮৪০-১৮৮৩) সাক্ষাৎ হয়। সেইসময় বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত প্রচার প্রসারে তাঁদের দুজনের অবদান অপরিসীম। এরপর ওস্তাদ কাশেম আলী ঢাকার জয়দেবপুর রাজবাড়ি ও যদুভট্ট কলকাতায় ঠাকুরবাড়িতে চলে যান। সেই ধারাবাহিকতায় অনেক শিষ্য-শিষ্যা তৈরি হয়েছে যারা শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারক হিসেবে কাজ করে গেছেন। বিখ্যাত সরোদীয়া ওস্তাদ এনায়েত হুসেন খাঁ (১৮৯৪-১৯৩৮) এবং তবলীয়া ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁ (১৮৯৮-১৯৮০) তাঁরই গুণমুগ্ধ শিষ্য ছিলেন। এই ঘরানাকে তাঁরা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। অপরদিকে ঢাকার নবাব দরবারে অচ্ছন বাঈ- খেয়াল ও ঠুমরির সাথে বাংলাদেশের শ্রোতাকে সরাসরি যুক্ত করেন। আরো ছিলেন তবলীয়া সুপ্পন খাঁ। তবে আগেই বলা হয়েছে, বাঙালি ধ্রুপদ ও টপ্পাকে যেভাবে আপন করে নিয়েছিলেন সেভাবে খেয়াল ও ঠুমরিকে সহজে আপন করে নিতে পারেননি। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে খেয়াল জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং তারও আগে ঠুমরির প্রচলন হয় লক্ষ্মৌ-র নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্-র (১৮২২-১৮৮৭) বদৌলতে। তিনি মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত থাকলেও সংগীত ছিল তাঁর বেঁচে থাকার অন্যতম রসদ। নবাব ওয়াজেদ আলী মেটিয়াবুরুজে একটি অস্থায়ী দরবার করেছিলেন যেখানে নিয়মিত সংগীতের আসর বসত, বিশেষ করে ঠুমরি। নবাব নিজেও ঠুমরি রচনা করতেন ও গাইতেন। অপরদিকে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে খেয়াল প্রসারিত হওয়ায় সেইসময় রামপুর, আগ্রা, গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা ও কিরানা ঘরানার সংগীতগুণীরা বাংলায় অনুষ্ঠান করতে আসতেন, যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এখানে থেকে যান, তাঁদের শিষ্য পরম্পরায় বাঙালিরাও খেয়াল গানের চর্চায় মনোযোগী হন এবং খেয়াল গানের বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮) রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৫২-১৯২৫), গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬৩), আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯১৭-২০০৪), প্রমুখ গুণী শিল্পীরা গোয়ালিয়র ঘরানার অনুসারী। অপরদিকে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮), বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৯০১-১৯৭২), অনিল বাগচী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (১৯০৯-১৯৯৭) প্রমুখ রামপুর ঘরানার অনুসারী। ফৈয়াজ খাঁ'র (১৮৮০-১৯৫০) শ্যালক আত্তা হোসেন খাঁ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য বাংলায় আগ্রা ঘরানার প্রচলন করেন- এদের মধ্যে পূর্ণিমা সেন (১৯৩০-১৯৯৭), অরুণ ভট্টাচার্য (জন্ম-১৯৪৫), কল্পনা মুখোপাধ্যায় অন্যতম। আবার আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত গায়ক বশির আহমদ খাঁ'র (১৯০৩-১৯৬০) শিষ্য দিপালী নাগ (১৯২২-২০০৯), অপর্ণা চক্রবর্তী (১৯২৩-২০০৭) উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এছাড়া বিখ্যাত গায়ক ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র (১৯১৪-২০১০) গয়া ঘরানার বাহক হিসেবে বাংলায় অবদান রাখলেও তাঁর পরবর্তী এই ঘরানার বিলুপ্তি ঘটে। বাংলায় খেয়ালের জন্য কিরানা ঘরানা অনুসারী শিল্পীর সংখ্যা বেশি। ওস্তাদ আমীর খাঁ'র (ইন্দোর ঘরানা) গায়কিতেই বাঙালি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয় ফলে অন্য ঘরানার গায়ক

হওয়া সত্ত্বেও আমীর খাঁ (১৯১২-১৯৭৪) অনুসারী গায়কের সংখ্যাই ইদানীং বাংলায় বেশি দেখা যায়। তবে কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি যন্ত্রসংগীতের চর্চাও সেইসময় পরিলক্ষিত হয়।

> প্রধানত বাংলার তিনটি পৃথক অঞ্চলে সেতার-বাদনের সূচনার কথা জানা যায়। ঢাকা, বিষ্ণুপুর ও কলকাতায় বিচ্ছিন্নভাবে এবং স্বতন্ত্রধারায় সেতারবাদন আরম্ভ হয়েছিল। সেকালের এই তিনটি সঙ্গীত কেন্দ্রের মধ্যে প্রথমে সেতার-চর্চার সংবাদ পাওয়া যায় ঢাকায়।... ঢাকার সেতারীদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে পাওয়া যায় তিনি হলেন হরিচরণ দাস।... তিনি ঢাকার সম্ভবত প্রাচীনতম বাঙ্গালী সেতারী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। অন্তত তাঁর পূর্ববর্তী কোন বাঙ্গালী সেতারবাদকের কথা ঢাকায় এ যাবৎ জানা যায়নি; যাঁর বংশানুক্রমে সেতারের চর্চা অব্যাহতভাবে দেখা যায়।[৪]

তবে হরিচরণ দাসের পুত্র চৈতন্য দাস, তাঁর পুত্র রতন দাস এবং রতন দাসের পুত্র ভগবান দাস (১৮৪৪-১৯৩১) বংশানুক্রমে সেতারের চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী শিল্পীর কথা বললে যাঁর নাম সবার ওপরে থাকে তিনি ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর মেধার স্বাক্ষর শুধু বাংলাদেশ নয়, সারাবিশ্বে অঙ্কিত। ভারতবর্ষের অনেক গুণী শিল্পী তাঁর শিষ্য। বিশেষ করে যন্ত্রসংগীতে তিনি প্রবাদপ্রতিম। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে। পিতা সবদর হোসেন খাঁ সেতার বাজাতেন, তাঁর ভাইরাও বিভিন্ন যন্ত্রবাদনে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু শুধুমাত্র মনোরঞ্জন আর জীবিকা নির্বাহের তাগিদে তিনি সুরের সান্নিধ্য চাননি, চেয়েছেন সুরের সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে, মনের ভেতর জেগে ওঠা সুরের অদম্য পিপাসা নিবারণ করতে। তাই তো শৈশবে সুরের টানেই ঘর ছেড়েছেন, অক্লান্ত নিষ্ঠা ও সুদীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে পুরোপুরি নিজের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তিনি আজ সংগীত জগতের সর্বোচ্চ চূড়ায় অভিষিক্ত। সর্বশেষ সেনী ঘরানার ওস্তাদ উজীর খাঁ'র (১৮৬০-১৯২৭) কাছে তাঁর প্রকৃত তালিম হয়। অতঃপর তিনি সেনী ঘরানার প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসেন এবং সম্পূর্ণ নতুন মাইহার ঘরানার জন্ম দেন। তিনি কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি তবলা, সেতার, সুরবাহার, বেহালা, সানাই, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে সরোদ ছিল তাঁর মনের পিপাসা মেটানোর প্রধান বাদ্যযন্ত্র। অনেক বাঙালি-অবাঙালি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। বাঙালিদের মধ্যে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৯০১-১৯৭২), তিমিরবরণ ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৮৭), নীহারবিন্দু চৌধুরী (১৯০৭-১৯৮৭), পান্নালাল ঘোষ (১৯১১-১৯৬০), পণ্ডিত রবিশঙ্কর (১৯২০-২০১২), ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ (১৯২২-২০০৯), ভি জি যোগ (১৯২২-২০০৪), অন্নপূর্ণা দেবী (১৯২৭-২০১৮), পণ্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩১-১৯৮৬), আশীষ খাঁ (জন্ম ১৯৩৯), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (১৯৪২-২০০১) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ও বিকাশে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ'র অবদান অপরিসীম। "ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মধ্যে সংগীত প্রতিভার বীজ বাল্যকালে প্রসুপ্ত ছিল, ধীরে ধীরে বিচিত্র পরিবেশে ও সহায়তায় তার সংস্কার হতে থাকে এবং পরিণত বয়সে ঐ প্রতিভা সহস্রদল পদ্মের মত উন্মোচিত ও প্রসারিত হয়ে আলাউদ্দিন খাঁকে বিশ্বপ্রশংসার শীর্ষ ও সমুন্নত কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।"[৫]

পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা, প্রচার ও প্রসারে তাঁর পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। (১৯৪০-১৯৫০)–এর দশকে গুল মুহম্মদ খাঁ (১৮৭৬-১৯৭৯), ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ

(১৮৮৪-১৯৬৭), মুহম্মদ হোসেন খসরু (১৯০৩-১৯৫৯), আবেদ হোসেন খাঁ (১৯২৯-১৯৯৬), খাদিম হোসেন খাঁ প্রমুখ বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশ দশকের শেষদিকে ঢাকায় আসেন লক্ষ্মৌ ঘরানার প্রখ্যাত সেতারবাদক ওয়ালীউল্লাহ্ খাঁ (১৮৯০-১৯৫১)। ত্রিশের দশকে ঢাকায় আসেন ওস্তাদ গুল মুহম্মদ খাঁ, তাঁর গায়নশৈলী সারা বাংলাদেশে সাড়া জাগিয়েছিল। সে সময় তাঁর অনেক শিষ্য-প্রশিষ্য তৈরি হয়েছিল। তাঁর প্রায় সমসাময়িক মহারাষ্ট্রের পন্ডিত নারায়ণ রাও যোশী (১৯১৪-১৯৮৬), চিন্ময় লাহিড়ী (১৯২০-১৯৮৪)– ঢাকা বেতারে রাগসংগীত গেয়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ধীরে ধীরে ঢাকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা প্রসার পেতে থাকে।

বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কয়েকটি জমিদার বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতার কথা না বললেই নয়– তার মধ্যে ঢাকা নবাব এস্টেট, ভাওয়াল রাজা (গাজীপুর), কাশিমপুর জমিদার বাড়ি, বলধা এস্টেট, মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ি, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, গৌরীপুর জমিদারবাড়ি, রামগোপালপুর জমিদারবাড়ি, ময়মনসিংহ রাজবাড়ি উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ জমিদার বাড়িতেই শিল্পীরা বেতনভুক্ত ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিশেষ করে ঢাকার বিভিন্ন অভিজাত শ্রেণির বাসায় শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর বসত। সেইসব আসরে ভারত, পাকিস্তান থেকে বিখ্যাত সব শিল্পীরাও আসতেন। এর ধারাবাহিকতা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল। এছাড়া তৎকালীন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে রাতব্যাপী শাস্ত্রীয় সংগীত উৎসব হত ফলে শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচার ও এর প্রতি নতুন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়তে থাকে। এরপর একে একে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় শিল্পকলা একাডেমিসহ বিভিন্ন সংগীত একাডেমি চালু হয় এবং বিভিন্ন ছোট-বড় উৎসব শুরু হয়; যার মধ্যে শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী অন্যতম। শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠীর প্রধান শফিউর রহমান (১৯৩২-২০১১) তাঁর আত্মার তাগিদে ভালোবাসা থেকে শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, বর্তমানে তাঁর স্ত্রী উষা রহমান এই উদ্যোগ সফলতার সাথে চলমান রেখেছেন। শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী শাস্ত্রীয় সংগীতের এই নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের অনেক প্রতিভাবান শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার্থী ও নবাগত শিল্পীকে তার প্রতিভা বিকাশে সহযোগিতা করেছে। এরপর ছায়ানট শিল্পী তৈরির পাশাপাশি সংগীতে শক্ত ভিত তৈরির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় সংগীত বাধ্যতামূলক করেছে, যার দরুণ অনেকেই এর প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এছাড়া বৃহত্তর ময়মনসিংহ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেলাভিত্তিক বিভিন্ন সংগীত একাডেমি গড়ে উঠেছে।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে বাংলায় (অবিভক্ত বাংলা) রাগসংগীত ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়েছিল এবং বাংলা সংগীত– বিষয়বৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করছিল। সেসময় রাগসংগীতের চর্চাও বহুলভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল, যা বাঙালির কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার প্রতি আগ্রহ-অনুরাগ অনেক মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। আবেগ, নিষ্ঠা, অনুশীলন ও সাধনায় ক্রমে শাস্ত্রীয় সংগীতের ইতিহাসে বাঙালি শিল্পীরাও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ও অবদান রেখেছে যার স্বাক্ষর আজও আমরা দেখতে পাই। বর্তমানকালে কলকাতা ও বাংলাদেশের শ্রোতাদের শাস্ত্রীয় সংগীতের রসিক শ্রোতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যতটুকু চর্চা এখন হয় তার

সিংহভাগ হয় ভারতে, এরপর বাংলাদেশে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থীই ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং বিভিন্ন ঘরানার গুরুর নিকট তালিম নিয়ে এসেছেন। এছাড়া বাংলাদেশেও বিভিন্ন গুরুর শিষ্যরা রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের নিজস্ব মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

যদি শুধুমাত্র বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার কথা বলা হয় তা হলে ৫২ পরবর্তী চর্চা, প্রচার ও প্রসারের কথা বলতে হয়। তবে সেসময় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অস্থির সময় চলছিল। যে কথাটি বারবার উঠে আসে তা হল– সঠিক গুরুর অভাব, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ভারত-পাকিস্তান ভাগের সময় থেকেই লেগে ছিল, ফলে সংস্কৃতির বিকাশ নাটকের ক্ষেত্রে দেখা গেলেও সংগীতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম দেখা গেছে। লোকসংগীতের চর্চা আপন গতিতে চললেও শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা সেইভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। কিছু গুণী শিল্পী তাঁদের শিকড় ভালোবেসে এদেশে থেকে গিয়ে শিক্ষার্থী তৈরি করলেও যেহেতু শাস্ত্রীয় সংগীত একটি ধারাবাহিক চর্চা সাপেক্ষ বিষয় সেহেতু তাঁদের ক্ষেত্রে সেইসময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখার সুযোগ কম থাকায় মানোয়ন্নয়নও সম্ভব হয়নি। তাই সেই শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী হিসেবে খুব বেশি কাউকে পাওয়া না গেলেও অন্যান্য গানের চর্চা যাঁরা করেন, তাঁদের শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রাথমিক জ্ঞান থাকায় বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা আজও অব্যহত রয়েছে, নয়ত শিল্পী সংকটে ভুগে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রচারে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের (বেতার, টেলিভিশন, ইন্টারনেট) পাশাপাশি বড় বড় উৎসব হতে দেখা যায়, যার মধ্যে বেঙ্গল উচ্চাঙ্গ সংগীত উৎসব আন্তর্জাতিক মানের একটি শাস্ত্রীয় সংগীতের উৎসব। ঢাকা এবং এর আশেপাশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে আজকাল অনেক শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া দেশব্যাপী বিভিন্ন জেলায় জেলায় সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা ও উৎসব হয়ে থাকে। এখন মানুষের কাছে খুব সহজে সবকিছু পৌঁছালেও শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রকৃত শ্রোতা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে যারা শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি কিছুটা আগ্রহী, তারাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। দেখা যাচ্ছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখলেও শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী হয়ে উঠছে না। এর কারণ হিসেবে বলা যায় শিক্ষার্থীরাও সংগীতের প্রতি অনুগত নয়, আবার এও বলা যায়– বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও হয়তো অনুকূলে নেই। কিন্তু এও সত্য যে, একমাত্র মুঘল আমল ছাড়া শিল্পীরা প্রতিটি সময়েই স্রোতের প্রতিকূলে গিয়ে সংগীত চর্চা করেছে। ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও গত একশত বছর আগেও সংগীতশিল্পীদের ২য় সারির গণ্য করা হতো। যদিও রাজা, বাদশাহ্ বা জমিদারগণ (যারা প্রকৃত সংগীত রসিক ছিলেন) সংগীতশিল্পীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতেন। তারপরেও শাস্ত্রীয় সংগীতের এই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়নি। আমাদেরও হাল ছেড়ে দিলে চলবে না, কারও না কারও মাধ্যমে শাস্ত্রীয় সংগীত ঠিকই মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে থাকবে, যেমনটি বর্তমানেও আছে। বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিয়ে আসতে পঞ্চাশের দশক থেকে নব্বই দশককাল পর্যন্ত যে কয়েকজন বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হল–

ফুল মোহাম্মদ খাঁ (শাস্ত্রীয় সংগীত), গুল মোহাম্মদ খাঁ (১৮৭৬-১৯৭৯, শাস্ত্রীয় সংগীত), মুন্সী রইসউদ্দীন (১৯০১-১৯৭৩, শাস্ত্রীয় সংগীত), মুহম্মদ হুসেন খাঁ খসরু (১৯০৩-১৯৫৯, শাস্ত্রীয় সংগীত), হিরণ চন্দ্র নট্ট (১৯০৬-১৯৮৫, শাস্ত্রীয় সংগীত), নীহারবিন্দু চৌধুরী (১৯০৭-১৯৮৭, শাস্ত্রীয় সংগীত), মিথুন দে (১৯১৪-১৯৮৬, শাস্ত্রীয় সংগীত), প্রফুল্ল কুমার সেন (১৯১৫-১৯৮২), ফুলঝুরি খান (১৯২০-১৯৮২, শাস্ত্রীয় সংগীত), বারীণ মজুমদার (১৯২১-২০০০, শাস্ত্রীয় সংগীত), অজয় সিংহরায় (১৯২১-২০০১, সেতার), রঘুনাথ দাস (১৯২৬-২০০২, শাস্ত্রীয় সংগীত), কামরুজ্জামান মনি (১৯২৭-২০১১, তবলা), মীর কাশিম খান (১৯২৮-১৯৮৪, শাস্ত্রীয় সংগীত), অমরেশ রায় চৌধুরী (জন্ম ১৯২৮, শাস্ত্রীয় সংগীত), জাকির হোসেন (১৯২৯-২০১১, শাস্ত্রীয় সংগীত), আব্দুল আজিজ বাচ্চু (১৯৩০-১৯৯৯, শাস্ত্রীয় সংগীত), রামকানাই দাস (১৯৩৫-২০১৪, লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত), ওস্তাদ আখতার সাদমানী (১৯৩৪-২০০৩, শাস্ত্রীয় সংগীত), শেখ সাদী খান (সুরকার), মদন গোপাল দাশ (জন্ম-১৯৩৯, তবলা), বাবর আলী, রওশন আরা মুস্তাফিজ (নজরুল সংগীত), খুরশিদ খান (১৯৩৫-২০১২, শাস্ত্রীয় সংগীত), পবিত্রমোহন দে (জন্ম ১৯৩৭, শাস্ত্রীয় সংগীত), কুমুদ রঞ্জন গোস্বামী, ইয়াসিন খান, নীরদবরণ বড়ুয়া (১৯৩৬-২০০১, শাস্ত্রীয় সংগীত), ইলা মজুমদার (১৯৪১-২০১১, শাস্ত্রীয় সংগীত), পি. সি. গোমেজ (শাস্ত্রীয় সংগীত), নারায়ণ চন্দ্র বসাক, ফেরদৌসী রহমান (লোকসংগীত ও শাস্ত্রীয় সংগীত), মিহির লালা (জন্ম ১৯৪১), জয়ন্তী লালা, বিনোদ আচার্য, প্রফুল্ল চন্দ্র, গোপাল দত্ত, সমীর দাস, আব্দুস সাত্তার (১৯৪২-২০১৩, গীতিকার ও সুরকার), নীলুফার ইয়াসমিন (১৯৪৮-২০০৩, শাস্ত্রীয় সংগীত ও নজরুল সংগীত), আজাদ রহমান (১৯৪৪-২০২০, সুরকার ও বাংলা খেয়াল), শ্যামাচরণ দত্ত, সুরেশ চক্রবর্তী, আভা আলম (১৯৪৭-১৯৭৬, শাস্ত্রীয় সংগীত), মায়া সেনগুপ্ত, রবিউল হোসেন (১৯৪৭-২০১৩, শাস্ত্রীয় সংগীত), আব্দুল মালেক খান, ইতি রানী ভৌমিক, অতীন্দ্রনাথ গুপ্ত, সৌরেন্দ্র লাল দাস, শিবশঙ্কর মিত্র, বিপিন চট্টোপাধ্যায়, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, লালমোহন মুখোপাধ্যায়, ঊষারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। নব্বই দশক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাঁরা শাস্ত্রীয় সংগীতকে একটা নতুন রূপ দিতে চেয়েছেন, নব উদ্যোমে বর্তমান প্রজন্মকে শাস্ত্রীয় সংগীত শিখতে/জানতে বা শুনতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য– নিয়াজ মোহাম্মদ চৌধুরী (শাস্ত্রীয় সংগীত), সঞ্জীব দে (১৯৫৬-২০২১, শাস্ত্রীয় সংগীত), অনুপ বড়ুয়া (শাস্ত্রীয় সংগীত), স্বর্ণময় চক্রবর্তী (শাস্ত্রীয় সংগীত), অনিল কুমার সাহা (শাস্ত্রীয় সংগীত), শেখ সাত্তার মোহাম্মদ (শাস্ত্রীয় সংগীত), অসিত দে (শাস্ত্রীয় সংগীত), ড. অসিত রায় (শাস্ত্রীয় সংগীত), ড. আলী এফ এম রেজওয়ান (শাস্ত্রীয় সংগীত) প্রমুখ।

এছাড়া সংগীততাত্ত্বিক হিসেবে মোবারক হোসেন খান (১৯৩৮-২০১৯)[৬], ড. করুণাময় গোস্বামী (১৯৪২-২০১৭)[৭], অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (১৯৫৫-২০১১)[৮] প্রমুখ অনেক সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে সংগীত নিয়ে কাজ করে গেছেন। ফলে সংগীত নিয়ে যাদের আগ্রহ তাদের তত্ত্বীয় দিক থেকে সঠিক নির্দেশনা দিয়েছেন। বাংলাদেশের সংগীতের তত্ত্বীয় দিককে তাঁরা ঋদ্ধ করেছেন।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ চালু করে এবং বর্তমানে মোট ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) এবং চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রবীন্দ্র-মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র সৃজনকলা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্ত-মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ডেভলাপমেন্ট অল্টার্নেটিভ) সংগীত বিভাগের কার্যক্রম চলছে, যা সংগীতে উত্তরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সংগীত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই দেশের তিনটি মহাবিদ্যালয়ে (ঢাকা সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয়, দিনাজপুর সংগীত মহাবিদ্যালয়, পাবনা সাধন সংগীত মহাবিদ্যালয়) উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষাদান ও চর্চা হয়ে আসছিল। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বর্তমানে ঢাকা সরকারি সংগীত মহাবিদ্যালয় ব্যতীত অপর দুটি সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সংগীত শিক্ষা কার্যক্রম রুদ্ধ প্রায়।

এছাড়াও সংগীতসভা, সংগীত সম্মেলন প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে সাধারণ শ্রোতা ও শিল্পীর মধ্যে সহজ সম্পর্ক তৈরি করা এবং শুদ্ধ সংগীতের সাথে নতুন শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, নজরুল ইন্সটিটিউট, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় জেলায় এ জাতীয় আয়োজন করছে। অন্যদিকে অনেক সংগঠন ব্যক্তিগত উদ্যোগে সভা, সম্মেলন ও উৎসবের আয়োজন করছে, তন্মধ্যে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন উল্লেখযোগ্য। এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে রাগ সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট করতে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আয়োজিত রাগ সংগীতের অনুষ্ঠান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

> স্বাধীনতার পর দেশের শীর্ষস্থানীয় সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে উচ্চাঙ্গ সংগীত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষার স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান খুবই কম। যে সকল সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর অধিকাংশই লঘু সংগীতভিত্তিক। ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি, সংগীত শিক্ষাভবন, ধ্রুব পরিষদ তাদের অন্যতম। কিছু সংগঠন রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সময়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এদের মধ্যে শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠী (ঢাকা), সদারঙ্গ সংগীত পরিষদ (চট্টগ্রাম), হিন্দোল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী (রাজশাহী), লক্ষ্যাপার সংগীত সম্মেলন (নারায়ণগঞ্জ) এবং ছায়ানট আয়োজিত উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি ২০১২ সাল থেকে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে বিশ্বের সর্ববৃহৎ উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলন আয়োজন করে চলেছে। ২০১২ সালে তিনদিনের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের ১ জন কণ্ঠসংগীত শিল্পী এবং চারজন যন্ত্রসংগীত শিল্পীর সংগীত পরিবেশনের সুযোগ ঘটেছিল। এছাড়া ভারতবিখ্যাত বহু উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীর পরিবেশনা ছিল এই সম্মেলনে। এই ধরণের উদ্যোগ বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসারে নিঃসন্দেহে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জানা যায়, প্রায় বিশ হাজার দর্শকশ্রোতা উপস্থিত ছিলেন এই সম্মেলনে। সম্মেলন-পরবর্তী বেঙ্গল প্রকাশিত 'কালি ও কলম' পত্রিকায় আবদুশ শাকুরের লেখা থেকে জানা যায় যে, দর্শক শ্রোতাদের আরও বেশি করে সাংগীতিক স্বাক্ষর বা সমঝদার হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্মেলন একটি বড় ভূমিকা রাখবে।[৯]

এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে রাগসংগীত চর্চা প্রসারের পাশাপাশি এর যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। তবে এই চর্চার গুণগত মান উৎকর্ষ লাভ করেছে কি না সে বিষয়ে এখনো সংশয় রয়েছে। বর্তমানকালে প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় সবকিছু সহজে শোনা ও দেখা যায়, কিন্তু একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চায় যে নিষ্ঠা, অধ্যাবসায় ও সাধনা প্রয়োজন– তা অনুপস্থিত। এছাড়া টেলিভিশনভিত্তিক সংগীত প্রতিযোগিতা ও জনপ্রিয়তার পেছনে

ছোটার প্রবণতাও শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্তরায় হয়ে নয়, উন্নত করার উদ্দেশ্যেই নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে। এখন শুধু দরকার শিক্ষার্থীদের শেখার প্রকৃত ইচ্ছা, তবেই বাংলাদেশের শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা আরও সুদূরপ্রসারী হবে।

> একথা সত্য যে, বাংলাদেশে রাগসংগীত চর্চার প্রচার-প্রসার ঘটেছে এবং যথেষ্ট উন্নতি সাধনও হয়েছে। কিন্তু রাগসংগীত চর্চা যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তা গুণগতমানসম্পন্ন হয়েছে কি না- এ সম্বন্ধে সংশয় আছে। প্রযুক্তি ও তথ্য প্রবাহের এই অবাধ যুগে সবকিছুই সহজে শোনা ও দেখা যায় বটে; কিন্তু রাগসংগীত শিক্ষালাভের জন্য যে অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও সাধনার প্রয়োজন তা কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশের রাগসংগীত চর্চায় অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে হয়তো বলবেন, রাগসংগীত চর্চা-শিক্ষার পরিবেশ নেই, পৃষ্ঠপোষক নেই (আগে যেমন রাজা-বাদশা, নবাব, জমিদার-অভিজাত শ্রেণীরা করতেন, নিজেরাও চর্চা করতেন), উৎসাহ-উদ্যোগ নেই, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং চলমান জীবনের গতিময়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, সে সময়-অবসর-অবকাশ কোথায় নিরবচ্ছিন্ন রাগসংগীতে তালিম নেবার? তবু আশার কথা, প্রবন্ধের শুরুতে নিবেদন করেছি যে, সংগীতের মূলভিত্তি হল রাগসংগীত। রবীন্দ্র-নজরুলের গানের মধ্যে রাগসংগীতের নানা ধারার সম্মিলন বৈচিত্র্যময় সুরের ডালি সাজানো হয়েছে। সেজন্য প্রয়োজন প্রকৃত কণ্ঠশীলনের, আর তা করতে হলে রাগসংগীত অনুশীলন অপরিহার্য। নব শতকের শুরুতে এসে বাংলাদেশের রাগসংগীত চর্চার বিবর্তন বিকাশ বিশশতকে কী রূপ নিয়েছে, কী পেয়েছি আর কী পাই নি তার বিশে- ষণ, পর্যালোচনায় একথা স্পষ্ট হয় যে, শত বাধাবিপত্তি পেরিয়ে বাঙালি রাগসংগীতকে আপন করে নিতে চেষ্টা করেছে, নিজের মতো করে রাগসংগীতকে বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করেছে এবং বাংলা সংগীতও রাগসংগীতের সংস্পর্শে এসে বিকশিত ও বিভাসিত হয়েছে।[১০]

শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করে জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য; সারা বছর সেই অর্থে কোন শাস্ত্রীয় সংগীত অনুষ্ঠান হয় না, যে কয়েকটি হয় তার আর্থিক দিকটাও খুব ক্ষীণ থাকে। ফলে সারা বছর শিক্ষাদান করে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হয়, যা দুঃখজনক। তার পরেও কিছু আত্মত্যাগী শিল্পী ও শাস্ত্রীয় সংগীত রসিক শ্রোতাদের কল্যাণে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠপোষকেরর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা কয়েকজন রসিক শ্রোতা মিলেই আয়োজকের ভূমিকা পালন করে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা অব্যাহত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বর্তমানকালে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার পরিধি কিছুটা বাড়লেও জীবিকা নির্বাহের খাতিরে পাশাপাশি অন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ, অধিকাংশই খেটে খাওয়া মানুষ– যারা কাজশেষে বিশ্রাম ও বিনোদন পছন্দ করে। শাস্ত্রীয় সংগীত জনসাধারণের নয়, এর জন্য রসিক বা বোদ্ধা শ্রোতা প্রয়োজন। ফলে শুধু শিল্পীই নয়, শাস্ত্রীয় সংগীত বাঁচিয়ে রাখতে সঠিক শ্রোতাও তৈরি হওয়া প্রয়োজন। উপরোক্ত বিষয়গুলোর দিকে যত্নবান হলে এবং জনপ্রিয়তার পেছনে না ছুটে শিল্পচর্চায় মনোযোগী হলে আশা করা যায়, এই বিষয়গুলো থেকে খুব শীঘ্রই উত্তরণ সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চার পাশাপাশি বাংলা সংগীতের সুস্থ ধারা বজায় থাকবে, যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বহির্বিশ্বে আলোকিত করতে সহায়তা করবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর পাশাপাশি নবীন মেধাবী শিল্পীদেরও যদি গান গাওয়ার উপযুক্ততা তৈরি ও মঞ্চ সুবিধা দেয়া হয় তবে উভয় প্রজন্মই উপকৃত হবে। সবশেষে একথা বলা যায়, উচ্চস্তরের সংগীতজ্ঞ, নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থী, সংগীতপিপাসু শ্রোতা ও পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ আলোকিত করা সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১০৬

২ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৩ দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগসংগীত চর্চা*, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ৮৬

৪ দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগসংগীত চর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩-২১৫

৫ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, "শ্রদ্ধাঞ্জলি", *আলাউদ্দীন খাঁ : জীবন সাধনা ও শিল্পী*, অরুণকুমার বসু ও কঙ্কণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৫

৬ সংগীত গবেষক। রচিত গ্রন্থ– *সংগীত প্রসঙ্গ, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ, রাগ সংগীত, যন্ত্রসাধন, সংগীত গুণীজন, ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলি, সংগীত মালিকা, কণ্ঠসাধন, মুক্তিযুদ্ধের গান, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, সংগীত দর্পণ, উচ্চাঙ্গ সংগীত, গড়লো যারা সুরের তাজমহল, সংগীতামৃত, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ: জীবন ও সাধনা, সংগীতসাধক অভিধান, আমার সংগীত স্বজন, গীতমঞ্জরী, নজরুল সংগীতের বিচিত্র ধারা, সুরের স্বরলিপি, সংগীত সন্দর্শন*, নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দশ সংগীতজ্ঞ প্রভৃতি।

৭ সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক। রচিত গ্রন্থ– *সংগীত কোষ, বাংলা গানের বিবর্তন* প্রথম খণ্ড, *বাংলা গান স্বরলিপি– ইতিহাস, রবীন্দ্র সংগীত পরিক্রমা, রবীন্দ্র সংগীত স্বরলিপি, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, রবীন্দ্র নাট্যসংগীত, আব্বাসউদ্দিন, অতুলপ্রসাদের গান, রবীন্দ্রনাথ হান্টিংটন ও ভারতভাগ, বাংলাদেশের উচ্চাংগ সংগীত চর্চা ও গুণীজন, বাংলা গানের বর্তমান ও আরো, ভারত ভাগের অশ্রুকণা, রবীন্দ্রসংগীতকলা, কিশোর সংগীত, বাংলা গানের কথা, নজরুল সংগীত: জনপ্রিয়তার স্বরূপ সন্ধান, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* প্রভৃতি।

৮ সংগীত শিল্পী, সংগীত গবেষক ও শিক্ষক। রচিত গ্রন্থ– *হাসন রাজা- তাঁর গানের তরী, বাংলা গানের ধারা, গানের ঝরণাতলায়, লোকসংগীত, সংগীত-সংলাপ, হাজার বছরের বাংলা গান, বাউল কবি লালন ও তাঁর গান, অধরা মাধুরী, সুরশ্রীবাদন, পঞ্চ–গীতিকবির গান, রবীন্দ্রনাথ: পূর্ববঙ্গে লেখা গান, দেশাত্মবোধক গান ও স্বরলিপি, হারানো দিনের গান– স্বরলিপি, ভাষা ও দেশের গান–স্বরলিপি* প্রভৃতি)।

৯ অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫৮

১০ মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। অজয় সিংহরায়, *কালপুরুষের দর্পণে ও পূব বাংলার উচ্চাঙ্গ সংগীত*, প্রতিক্ষণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৬

২। অসিত রায়, *সংগীত অন্বেষা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৯

৩। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙালীর রাগসঙ্গীত চর্চা*, কলকাতা: ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৬

৪। প্রবীর সেনগুপ্ত (সম্পা. ড. অরুণ সরকার), *বাংলার গান বাংলাগান*, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৬

৫। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪

৬। মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, ঢাকা: প্যাপিরাস, ২০০৫

৭। যূথিকা বসু, *বাংলা গানের আঙিনায়*, কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ২০০৪

৮। শুদ্ধ সংগীত প্রসার গোষ্ঠীর সভাপতি ঊষা রহমানের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ঢাকা: নভেম্বর ২০১৯

৯। সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের সন্ধানে*, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৩

১০। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, "শ্রদ্ধাঞ্জলি", *আলাউদ্দীন খাঁ : জীবন সাধনা ও শিল্পী*, অরুণকুমার বসু ও কঙ্কণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৯৬

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

উনিশ শতকে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্য: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

মাহমুদা আক্তার পলি*

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জনস্বাস্থ্য আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, সুসংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন সমাজে মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনমানের উন্নয়ন, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং রোগ প্রতিরোধের বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়া-কৌশলকে জনস্বাস্থ্য বা Public Health বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে মৃত্যুঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষা করাই হল জনস্বাস্থ্যের মূল লক্ষ্য। কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার জনস্বাস্থ্য বেশ কিছু নিয়ামকের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, ভৌগোলিক ও পরিবেশগত উপাদান, খাদ্যাভাস, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসা পদ্ধতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য, উনিশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রের ন্যায় বাংলার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র ঢাকায় জনস্বাস্থ্যের এই পরিবর্তনের স্বরূপ কেমন ছিল, বিশেষত রোগ ব্যাধির কারণ অনুসন্ধান, পাশ্চাত্য চিকিৎসা সেবা প্রদানে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ, ভ্যাক্সিনেশন ইত্যাদি সহ ঢাকা জেলার সামগ্রিক জনস্বাস্থ্যের চিত্র এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভূমিকা

সুস্থ থাকার জন্য প্রাচীন সভ্যতার মানুষ বিভিন্ন কলা-কৌশল উদ্ভাবন করেছিল। দীর্ঘ সময় ধরে মানুষ রোগ-ব্যাধি, মহামারিকে নিজেদের কৃতকর্মের 'ঐশ্বরিক শাস্তি' (divine judgement) বলে মনে করত। তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে এ সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে এবং পাশ্চাত্যে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে ওঠে। ইউরোপীয়দের আগমনের সাথে বাংলায় এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও ঔষধপত্রের আগমন ঘটে এবং অন্যান্য প্রশাসনিক শাখার মত জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বলয়ের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, ১৬০৮ সালে মুগল সুবাদার ইসলাম খান চিশতি সুবাহ বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকায়। মুগলদের সময়ে প্রাদেশিক রাজধানী এবং ব্রিটিশ আমলের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার রয়েছে এক সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস। এ পর্যন্ত ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত যেসকল গবেষণামূলক গ্রন্থ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলিতে উনিশ শতকে ঢাকার জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়নি। উপরন্তু গ্রন্থগুলি প্রধানত নগর ঢাকার উত্থান ও নাগরিক জীবনের বিষয়াবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ। বর্তমান

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবন্ধে উনিশ শতকে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে; যেখানে নগরকেন্দ্রিক আলোচনার পাশাপাশি ঢাকার অভ্যন্তরীণ স্থানসমূহের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ঢাকা জেলার সীমারেখা

আলোচনার শুরুতে উনবিংশ শতাব্দীতে ঢাকা জেলার সীমানা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেলা। মুগল আমলে জেলা প্রথা বিদ্যমান থাকলেও তার অর্থ ছিল ভিন্নরূপ। এসময় আঞ্চলিক প্রশাসনের দায়িত্বে তিন ধরনের কর্মকর্তা ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের কাজটি করতেন আমিল এবং তার কর্তৃত্বের সীমানাকে বলা হতো পরগনা। আইন শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত ফৌজদারের এলাকা সরকার এবং বিচার কার্যে নিয়োজিত কাজীর সীমানা পরিচিত ছিল জেলা নামে।[১] কোম্পানি আমলে এই তিনটি এলাকাকে একত্র করে একটি নতুন প্রশাসনিক ইউনিট গড়ে তোলা হয় যার নামকরণ করা হয় জেলা (District) । ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম কোম্পানির শাসন এলাকাকে ১৯টি ভাগে ভাগ করে সমন্বিত জেলা সৃষ্টি করেন এবং প্রশাসক হিসেবে কালেক্টর নিযুক্ত করেন। এই ১৯টি জেলার মধ্যে ঢাকা ছিল অন্যতম।

বিভিন্ন সময়ে উদ্দেশ্য, কার্যাবলি এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ঢাকা জেলা প্রশাসনে নানা পরিবর্তন আনা হয়। ১৭৮১ সালে ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল। তবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থান যেমন, ১৮১১-তে ফরিদপুর ও ১৮১৭ সালে বাকরগঞ্জ ঢাকা কালেক্টরি থেকে পৃথক হয়ে যায়।[২] ১৮৪০ সালে জেমস টেইলর কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ হতে জানা যায়, ঢাকার উত্তরে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে বাকরগঞ্জ, পূর্বদিকে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমে ছিল ফরিদপুরের অবস্থান। পরবর্তীকালে প্রশাসনিক প্রয়োজন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ঢাকার পারিসরিক বৃদ্ধি ঘটে।[৩]

১৮৭২ সালে উপমহাদেশের প্রথম আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা জেলা ৩টি প্রশাসনিক এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

১. ঢাকা সদর: ঢাকা নগরীসহ এই মহকুমার আয়তন ছিল ১,৯২৬ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ১০,০৭,০৭৩ জন। প্রতি বর্গমাইলে ৫২৩ জন করে বসবাস করত। মোট ৭টি থানা যথা: লালবাগ, সাভার, কাপাসিয়া, রায়পুরা, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জের সমন্বয়ে মহকুমাটি গঠিত হয়েছিল।

২. মুন্সিগঞ্জ মহকুমা: ৪৪৬ বর্গমাইল আয়তনের এই মহকুমায় ৪,৫৯,৪৭৪ জন লোকের বসবাস ছিল। প্রতি বর্গমাইলে ১,০৩১ জন মানুষ বাস করত। ২টি থানা যথা: মুন্সিগঞ্জ ও শ্রীনগর এর অর্ন্তভুক্ত ছিল।

৩. মানিকগঞ্জ মহকুমা: ৫২৫ বর্গমাইলের মহকুমাটিতে ৩,৮৬,০৪৬ লোক বসবাস করত এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৭৩৫ জন। মানিকগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, হরিরামপুর এই ৩টি থানা নিয়ে মহকুমাটি গঠিত হয়েছিল।[৪]

অর্থাৎ, ১৮৭২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা জেলার মোট আয়তন ছিল প্রায় ২,৯০২ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৯ লক্ষ। প্রথমদিকে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা সদর ইউনিটের সাথে সংযুক্ত থাকলেও পরে তাকে পৃথক মহকুমায় ভাগ করা হয়। ১৮৭৬ সালে মদনগঞ্জ বন্দরকে নারায়ণগঞ্জের সাথে অন্তর্ভুক্ত করে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়।

১৯০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা ছিল নিম্নরূপ:[৫]

সাবডিভিশন	আয়তন (বর্গমাইল)	শহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার ঘনত্ব
ঢাকা	১২৬৬	১	২৬৪৭	৮,৮১,৫১৭	৬৯৬
নারায়ণগঞ্জ	৬৪১	১	২১৭৭	৬,৬০,৭১২	১০৩১
মুন্সিগঞ্জ	৩৮৬	...	৯৭৮	৬,৩৮,৩৫১	১৬৫৪
মানিকগঞ্জ	৪৮৯	...	১৪৬১	৪,৬৮,৯৪২	৯৫৯
সর্বমোট	২৭৮২	২	৭২৬৩	২৬,৪৯,৫২২	৯৫২

১৮৭২ ও ১৯০১ সালের আদমশুমারির রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময়ের মধ্যে ঢাকা জেলার আয়তন খুব একটা পরিবর্তন না হলেও জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় জনসংখ্যার ঘনত্বে। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে এই ঘনত্ব ছিল ২৩৯, জার্মানিতে ১৮৯, ফ্রান্সে ১৮০ জন। সেই তুলনায় প্রতি বর্গমাইলে ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি উচ্চ ছিল।[৬] আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ (প্রতিটি বর্তমানে পৃথক জেলা) উনিশ শতকে ঢাকার সাথে অর্ন্তভুক্ত থাকলেও ঢাকার আয়তন ছিল মাত্র ২,৭৮২ বর্গমাইল। এর কারণ ছিল ঢাকার একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে ছিল নদী ও জঙ্গল। উত্তর দিকে ৬৭২ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে ছিল জঙ্গলের অবস্থান যা সাধারণত জেলার মোট আয়তনের এক পঞ্চমাংশ।[৭]

১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ঢাকা জেলার যে প্রশাসনিক সীমারেখা তাকে কেন্দ্র করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

ঢাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র ও রোগ-ব্যাধি

মুগলদের সময় হতে স্বাস্থ্যকর জেলা হিসেবে ঢাকার সুনাম ছিল। কৌশলগত সামরিক গুরুত্ব ও নদীবিধৌত সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য মুগলরা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করে।[৮] পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের ফলে ঢাকার প্রশাসনিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং ক্রমে উনিশ শতকের প্রথমদিকে ঢাকা নগরীর পতন ঘটে।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্যে ঢাকার এই পতনের চিত্র ফুটে ওঠে। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকা ভ্রমণ করে লেখেন,

> Dacca, Mr. Master says, is as I supposed, merely the wreck of its ancient grandeur. Its trade is reduced to the sixtieth part of what it was and all its splendid buildings, the castle of its founder Shahjehanguire, the noble mosque he built, the places of the ancient Nawabs, the factories and churches of the Dutch, French and Portuguese nations, are all sunk into ruin and overgrown jungle.[৯]

ঢাকা নগরীর এই পতনের ফলে শিল্প বাণিজ্য যেমন মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তেমনি জেলার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে করুণ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় ঢাকার জনস্বাস্থ্যের এই ভগ্নদশা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ঢাকা এতটাই অস্বাস্থ্যকর ছিল যে, অনেক সময় ইংরেজ প্রশাসনিক কর্মকর্তা এখানে বদলি হয়ে আসতে চাইতেন না।[১০]

শরীফ উদ্দিন আহমেদ ঢাকার পরিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

> ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ঢাকার নাগরিক জীবন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি একটি অস্বাস্থ্যকর এবং নোংরা শহরে রূপান্তরিত হয় যা কিনা শহরের প্রাকৃতিক বিন্যাস এবং জনগণের নাগরিক সচেতনতার অভাবের কারণে ঘটে। ...ঢাকার জনগণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যাপারে ছিল ভীষণ উদাসীন। ...ঢাকার বেশিরভাগ মানুষই ছিল খুব গরিব। দরিদ্রতার কারণে অধিকাংশ অধিবাসীরই আহার্য ছিল নিম্নমানের এবং তাদের বাসস্থান ছিল খুব খারাপ ও অস্বাস্থ্যকর। এ সমস্ত স্বল্পভুক আর নিম্নমানের ঘরবাড়ি ও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসকারী মানুষেরা নানা ধরনের অসুখ বিসুখের শিকার হত। প্রতি বছর তাই কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড, গুটি বসন্ত, ম্যালেরিয়া এবং দারিদ্র্যজনিত নানা ধরনের ব্যাধি বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটাত।[১১]

শহরের মত গ্রামগুলির স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল জরাজীর্ণ। গ্রামের অধিবাসীরা মাটির ঘর বানাতে বাড়ির আশেপাশে গর্ত খুড়ত যেগুলিতে বন্যার সময় পানি জমে, আগাছা জন্মে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের জন্ম হতো। ১৮৬৮ সালের স্যানিটারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বহু বছর ধরে জমে থাকা আবর্জনা পুরনো গ্রামগুলিতে পড়ে আছে, এই আবর্জনা সরানোর কোন উদ্যোগ নেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মানার ক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল অজ্ঞ এবং তারা যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করত। অধিকাংশ ল্যাট্রিন নদীর পাড়ে অবস্থিত এবং মৃতদেহ নদীর তীরে কবর দেওয়া হয়। মহিলাদের পর্দায় রাখতে অধিকাংশ বাড়ির চারদিকে ঘন গাছপালার বেড়া গড়ে তোলা হয়। এসকল কারণে রোগ-ব্যাধি ছিল গ্রামের মানুষের নিত্যসঙ্গী।[১২]

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে ঢাকার অস্বাস্থ্যকর অবস্থার পেছনে দুটি কারণ, যথা স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও দরিদ্রতাকে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া আরও বেশ কিছু নিয়ামক ঢাকার এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী ছিল। মুগল সরকার শান্তিরক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি প্রভৃতি পৌর দায়িত্ব পালনে কোতোয়াল পদ্ধতি প্রবর্তন করে। ১৮১৪ সালে কোতোয়াল পদটি বিলোপ করা হয়। নতুন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ইংরেজ কর্মকর্তা এদেশীয়দের অবস্থার উন্নয়নে তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি; ফলে শহরের পরিবেশ দ্রুত খারাপ হতে থাকে।[১৩] ঢাকার এই অস্বাস্থ্যকর

অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকা উল্লেখ করে জনসংখ্যার আধিক্য, কসাইখানাগুলির দূষিত বাতাস, বনজঙ্গলের আধিক্যের ফলে মশার উপদ্রব বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ময়লা নির্গমন প্রণালীর অভাবে বহুদিন ধরে সঞ্চিত ময়লার দুর্গন্ধ ছিল ঢাকার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অন্যতম প্রতিবন্ধক।[১৪]

বলা বাহুল্য, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা এবং সঠিক চিকিৎসার অভাবে মানুষ নানারকম রোগে আক্রান্ত হতো এবং অনেকে মৃত্যুবরণ করত। ঢাকার প্রধান রোগ ছিল জ্বর, কলেরা, ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, আমাশয়, চর্মরোগ, পেটের পীড়া ও গোদ রোগ ইত্যাদি।[১৫]

সাল	তালিকাভুক্ত জনসংখ্যা	মৃত্যু	মৃত্যুহার প্রতি হাজারে	প্লেগ	কলেরা	গুটি বসন্ত	জ্বর	পেটের পীড়া	আঘাতপ্রাপ্ত	অন্যান্য
১৯০১	২,৬৪৯,৫২২	৭৩,০১০	২৭.৫৫	০.০০০৪	২.৪৬	০.২০	১৮.১৯	১.১১	০.২৯	৫.২৯

উল্লিখিত ছক হতে দেখা যায়, ঢাকায় অধিকাংশ মানুষের মৃত্যুর কারণ ছিল জ্বর। প্রথমে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ১৮৭০ সাল হতে বাংলায় সরকারিভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; যদিও এ প্রক্রিয়াটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। গ্রামের চৌকিদারের উপর নিবন্ধনের দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছিল। কলেরা, গুটিবসন্ত ইত্যাদি রোগের মত কোন দৃশ্যমান উপসর্গ না দেখা গেলে চৌকিদার মৃত্যুর কারণ হিসেবে জ্বর উল্লেখ করত। উল্লেখ্য, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু হলেও তার উপসর্গ ছিল সাধারণ জ্বরের মত, যেহেতু এসকল রোগ সঠিকভাবে ডায়াগনোসিস করা সম্ভব হতো না, ফলে তাকে জ্বর উল্লেখ করে রিপোর্ট প্রদান করা হতো।[১৬]

শুধু ঢাকা নয়, বাংলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় মানিকগঞ্জে জ্বরের প্রকোপ ছিল অনেক বেশি। ১৮৭৩ সালে জ্বরে অধিক মৃত্যু হওয়ায় এই এলাকাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং সামগ্রিক অবস্থা অনুসন্ধানের দায়িত্ব সিভিল সার্জনের উপর অর্পিত হয়। তৎকালীন সিভিল সার্জন জেমস ওয়াইজ রিপোর্ট প্রদান করেন যে, প্রধানত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। পুরো গ্রাম জুড়ে জঙ্গল ও বদ্ধ জলাশয় এবং দূষিত খালের পানি পান এই জ্বরের কারণ হতে পারে। এ সম্বন্ধে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অবহিত করেন যে, খাদ্য, জীবনাচরণ একই রকম হলেও এ জ্বরে মুসলমানরা কম আক্রান্ত হয় যদিও এর কারণ অজ্ঞাত। স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ছিল হরির নাম নিয়ে তেতুলের শরবত পান এবং দিনে দুই বার গোসল করলে জ্বর ভালো হয়ে যায়। জ্বর প্রতিকারের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কুইনাইন বিতরণ, দশোরা খাল খনন, ও নির্গমন নালী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[১৭]

ইংরেজ সিভিলিয়ান আর্থার লয়েড ক্লে নারায়ণগঞ্জে জ্বরের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, পূর্ব বাংলার অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা অস্বাস্থ্যকর। বাড়ির চারদিকে ঘন জঙ্গল আর পচা ডোবা। জ্বর যে ঘটে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বরঞ্চ বার বার কেন হয়না এটাই বিস্ময়ের বিষয়![১৮]

১৮১৭ সালে ঢাকায় প্রথম কলেরা হয় সোনারগাঁয়ে। তৎকালীন সিভিল সার্জন ড. টডের নেতৃত্বে ৬ জন নেটিভ ডাক্তার কলেরা আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। ১৮২২-২৬ সালে এই রোগ আরও ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮২৫ সালে ঢাকা নগরীতে ৪২৭ জন মারা যায়। ১৮৩০-১৮৩৮-এর মধ্যে নেটিভ হাসপাতালে কলেরায় মৃত্যু হার ছিল ৪৮% ও রেজিমেন্টাল হাসপাতালে ৩৯.৩%।[১৯]

ঢাকায় কলেরা ছড়িয়ে পড়ার পেছনে মেলা ও তীর্থস্থানগুলির অন্যতম ভূমিকা ছিল। ১৮৭১ সালের মার্চ মাসে লাঙ্গলবন্ধে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করতে আসা ৪,০০,০০০ তীর্থযাত্রীর মধ্যে সর্বপ্রথম কলেরা দেখা দেয়। এসময় ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন রিপোর্ট প্রদান করেন যে, ৩০ মার্চ তীর্থস্নান শেষ করে ঢাকা ফেরত তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১১ জনের কলেরা শনাক্ত হয়।[২০] অন্যদিকে স্থানীয়দের ধারণা ছিল শীত মৌসুমে ঢাকায় কলেরার উৎস ছিল মুন্সিগঞ্জের বারুনি মেলা। ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বারুনি মেলায় ১০ জন কলেরা আক্রান্তের মধ্যে ৬ জন মারা যায়। পরবর্তীকালে মেলা থেকে গন্তব্যে ফিরে অনেক ব্যক্তি মারা যায়। প্রায় ১৫ দিন ধরে চলা এই মেলায় ৩০,০০০ দোকান ও বসবাসের জন্য স্থাপনা নির্মাণ করা হত এবং ধারণা করা হয় যে, স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশ থেকে কলেরাসহ অন্যান্য রোগের উৎপত্তি হতো। ভারতের অন্যত্র কলেরা ছড়ানোর জন্য ইংরেজ প্রশাসকগণ বারুনি মেলাকে দায়ী করতেন।

কলেরা মোকাবেলার জন্য মেলায় একজন দেশীয় ডাক্তার নিয়োগ ও ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি এটাও বলা হয় যে, সাময়িক স্থাপনা নির্মাণের ফলে যেসকল জমির মালিকেরা অর্থ পাচ্ছে, মেলা সুরক্ষার ভার তাদের উপরও বর্তায়। যত্রতত্র যাতে কেউ মলত্যাগ না করে, সেজন্য পরিখা খননের পাশাপাশি তদারকির ব্যবস্থা করা হয়।[২১]

কলেরা প্রতিরোধে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও প্রতি বছর এ রোগে ঢাকায় অসংখ্য প্রাণহানি ঘটত। ১৮৭৩ সালে ঢাকায় কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:[২২]

সর্বোচ্চ মৃত্যুর এলাকা	লালবাগ	ঢাকা শহর	শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ
মৃত্যুর সংখ্যা	২৮০	১৩০	৪৪৩	৩৭৩	১২৩
প্রতি হাজারে মৃত্যুহার	১.৯৭	১.৮৭	১.৭৮	১.৭৬	১.২২

কলেরার পাশাপাশি অনেক মানুষ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করত। সোনারগাঁও ও ভাওয়াল এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ছিল সবচেয়ে বেশি। এর পরিণতি হিসেবে সারা বছর ধরে জ্বর, প্লিহা বড় হয়ে যাওয়া ও পেটের দীর্ঘস্থায়ী পীড়া দেখা দিত। চার্লস ল্যাভেরণ ১৮৮০ সালে ম্যালেরিয়ার পরজীবী আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে মনে করা হতো বিল ঝিলের পানির সাথে বিভিন্ন আগাছা মিলিত হয়ে এক ধরনের রাসায়নিক এজেন্ট তৈরি করে যা ম্যালেরিয়ার উদ্ভব ঘটায়।[২৩] ১৮৬৮ সালে ঢাকা জেলার সিভিল সার্জন অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন যে, মহিলাদের পর্দায় রাখার জন্য বাঙালিরা গাছপালার বেড়া দিত যা ঘন জঙ্গলে পরিণত হয় এবং

ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি করে। দেখা যায় যে, নতুন গ্রামগুলির থেকে পুরাতন গ্রামগুলিতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব থাকত বেশি।

ঢাকার বাসিন্দারা প্রায় সারাবছর পেটের পীড়ায় ভুগত। দেখা যায়, আউশ ধান বৃষ্টি মৌসুমের আগে পাকত, এটি ভালভাবে না শুকিয়ে গরিব অধিবাসীরা ভক্ষণ করত, তাছাড়া বিল-ঝিল হতে সংগৃহীত অপাচ্য শাক-সবজি এবং সর্বোপরি দূষিত পানি পান ছিল এই পীড়ার কারণ। দারিদ্র্যজনিত কারণে শীত মৌসুমে অনেকে যথাযথ কাপড় পরিধান করতে পারত না, ফলে তারা ঠাণ্ডা, কাশি ও শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হতো।[২৪]

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত উদ্যোগ

ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য উন্নয়নে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি এবং ভ্যাক্সিনেশন এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম দিকে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশীয় জনগণের স্বাস্থ্য নিয়ে খুব একটা চিন্তা ভাবনা করেনি। সুতরাং স্বাস্থ্য সংরক্ষণে ব্যক্তিগত উদ্যোগই ছিল ভরসা। ক্রমান্বয়ে সরকার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করে; তবে তা প্রধানত সামরিক বাহিনী ও ইউরোপীয় জনগোষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত মহাবিদ্রোহের পর ব্রিটিশ রানি ভারতে অধিকতর উদার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। বলা যেতে পারে, এই ঘোষণা বাংলার জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে।

১৮৬৩ সালের মে মাসে ভারতে সেনাবাহিনীর অবস্থা পর্যালোচনা করে রয়্যাল কমিশন একটি রিপোর্ট প্রদান করে যেখানে সেনাবাহিনীতে মৃত্যুহার কমানো ও সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে স্যানিটারি কমিশন গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়, এদেশীয় জনগণের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যতীত সৈন্য মৃত্যুহার কমানো সম্ভব নয়।[২৫] তাছাড়া রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে রোগ-ব্যাধি ছিল একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। রোগে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মৃত্যুবরণ ও মহামারির সময়ে মানুষের স্থানান্তরণের কারণে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হতো। সেনাবাহিনীতে মৃত্যু ও রাজস্ব আদায় ব্যাহত হওয়া এই দুটো বিষয়ই ছিল সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের অন্তরায়। ফলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে এদেশীয়দের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দিকটি উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। ১৮৬৭ সালে ভারত সচিব সমগ্র ভারতে একটি সাধারণ স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অগ্রণী হন। এসময় ড. ডি. বি স্মিথকে বাংলার জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়।[২৬]

১৮৬৪ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠার পর নগরীর সমস্যাসমূহ সমাধানকল্পে নানা পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল: রাস্তা সম্প্রসারণ, মল-মূত্র নিষ্কাশনে শৌচাগার নির্মাণ, উন্নত নর্দমা ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, শবদাহ ও সমাধিস্থ করার জন্য শ্মশানঘাট ও কবরস্থান নির্মাণ ইত্যাদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা।[২৭] মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে শহরের

স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামগুলির স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ১৮৬৮ সালের স্যানিটারি আইনে ৩৪টি নিয়মের কথা বলা হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে অধিকাংশ রোগের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া কমানো সম্ভব।

কোথাও মহামারি দেখা দিলে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলা হয়:[২৮]

ক. অসুস্থ ব্যক্তিকে আলাদা করে রাখতে হবে।
খ. অসুস্থ ব্যক্তি মারা গেলে যত দ্রুত সম্ভব গ্রাম থেকে যথেষ্ট দূরত্বে মাটি দিতে হবে বা পোড়াতে হবে।
গ. কলেরা মহামারির সময় কাঁচা ফল বা কম সেদ্ধ খাবার পরিহার করতে হবে।
ঘ. কলেরা আক্রান্তের ব্যবহার্য জিনিসপত্র গর্ত খুড়ে দ্রুত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, প্রয়োজনে চারকোল ও লেবু মাটিতে দেওয়া যায় যাতে করে বিষাক্ততা কমে, মৃত ব্যক্তির জিনিসপত্র কোনভাবেই পানিতে ধোয়া যাবেনা।

জমিদার, তালুকদার, হেডম্যান ও রায়ত সবাইকে এই নিয়মসমূহ মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। তাছাড়া নির্দেশ দেওয়া হয়, এলাকাতে অসুস্থতা লক্ষ করলে জমিদার জেলা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য নিকটস্থ থানায় খবর প্রেরণ করবেন।[২৯]

পানি সরবরাহ ব্যবস্থা

একটি বিষয় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকাবাসীর রোগে ভোগার অন্যতম কারণ ছিল বিশুদ্ধ পানির অভাব। শহরে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও অভিজাত শ্রেণি কুয়ার পানি ব্যবহার করত। যদিও বর্ষাকালে ও এ কূপগুলো প্লাবিত হতো এবং এসব স্থানে রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি। সাধারণ্যের জন্য নদী, বিল, ঝিলের পানি ছিল খাবার পানির প্রধান উৎস। বন্যাসহ বিভিন্ন কারণে এই পানি দূষিত হতো। যেমন কাঠের উচ্চমূল্যের কারণে অনেকসময় শবদেহ আংশিক পুড়িয়ে তা নদীতে ফেলা হতো। সরকারি কবরস্থানের অভাবে মুসলমানরা মৃতদেহ নদীতীরে কবর দিত। আবার পাট পচানোর জন্য কৃষকরা যত্র তত্র জলাশয় ব্যবহার করে, ফলে পানি পানের অযোগ্য হয়ে পড়ত এবং এলাকাগুলিতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিত।[৩০]

গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে রান্না এবং খাওয়ার জন্য প্রতিটি গ্রামে অন্তত একটি জলাধার সংরক্ষণের পরামর্শ দেওয়া হয়। গোসল ও অন্যান্য কাজের জন্য পৃথক পুকুর ব্যবহার করার কথা বলা হয়। পানি ফুটিয়ে বা চারকোল ও বালুর মাধ্যমে ছেঁকে খাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। কুয়াগুলির তলা নিয়মিত পরিষ্কার ও ঢাকনা ব্যবহার করতে বলা হয়। সরকারের পক্ষ থেকে মানিকগঞ্জে জলাধার নির্মাণ ও গর্ত ভরাটের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। তবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় এ কাজে স্বেচ্ছাশ্রমই ছিল ভরসা। জলাধার নির্মাণের ক্ষেত্রে শর্ত ছিল, জমির মালিক প্রতিশ্রুতি দেবেন যথাযথভাবে পানি সংরক্ষণ করা হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, জমিদার সরকার কর্তৃক আরোপিত এরূপ বিধি-নিষেধ মানতে নারাজ ছিলেন।

এসব কারণে পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল ধীর গতির। ১৯০৯ সালের মধ্যে সরকার ঢাকায় ২৭৪টি কুয়া খনন করেছিল।[৩১]

নগরীতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ১৮৭৪ সালে লর্ড নর্থব্রুক কর্তৃক ওয়াটার ওয়ার্কসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ছিল ঢাকাবাসীর স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাইলফলক। ১,৯৫,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পে ঢাকার নবাব আবদুল গণি এক লক্ষ টাকা ও মিউনিসিপ্যালিটি অবশিষ্ট টাকা প্রদান করে।[৩২] প্রথম দিকে প্রধান সড়কগুলিতে এই পানি সরবরাহ করা হতো। কিন্তু পুরো শহরে এই পানি সরবরাহ করা না হলে স্কিমটি সফল হবেনা বলে ১৮৭৮ সালের স্যানিটারি রিপোর্টে অভিমত প্রদান করা হয়।[৩৩]

স্কিমটি সফল করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সরকার এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির মধ্যে আর্থিক লেনদেন ছিল ধীরগতির, কোন পক্ষই ওয়াটার ওয়ার্কসের উন্নয়নে তেমন একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।[৩৪] ১৮৯১ সালে ১,২৫,০০০ টাকার বিনিময়ে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সর্বত্র পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। চার টাকা মাসিক করের বিনিময়ে এই পানি বাসগৃহে সরবরাহ করা হতো।[৩৫] ১৯০৪-০৫ সালে নারায়ণগঞ্জে ১,৭৯,০০০ টাকা ব্যয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৬] বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ফলে রোগে আক্রান্তের পরিমাণ কমে যায়। পরিসংখ্যান হতে জানা যায়, ১৮৬৯-এর পর থেকে ঢাকায় কলেরার প্রকোপ অনেকাংশে হ্রাস পায়।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক কোন সংস্কার প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থের যোগানের অভাব। ১৮৯৪-৯৫ সালে ঢাকার স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন খাতে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:[৩৭]

মিউনিসিপ্যালিটি	পানি সরবরাহ	নির্গমন নালী	রাস্তা সংস্কার ও ল্যাট্রিন	হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি	ভ্যাক্সিনেশন	বাজার ও কসাইখানা
ঢাকা	১৪,৭৬৯	৩,১৯৩	৫০,৬১৭	১৯,৩৭১	৭৭৩	২,৬৬০
নারায়ণগঞ্জ	.....	১,১৬৭	১৯,১৭৪	২,৬৪৮	১২৮	.....

মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ প্রাথমিকভাবে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্পগুলি তেমন একটা সফল হয়নি। এ সম্পর্কে বাংলার স্যানিটারি কমিশনার ডা. গ্রেগের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য,

> Municipal Commissioners are doing what they can to improve the sanitary condition of their towns, but although a good deal has been done and is being done, I am again compelled to remark that in many cases municipal income is wasted on temporary works and on works of minor importance, while works of a more needed, substantial, and lasting nature, such as drainage, water supply, and public latrines are neglected.[৩৮]

হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র

১৮০৩ সালে মাত্র ৪০টি আসন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নেটিভ হাসপাতালটি ছিল এ অঞ্চলের প্রথম হাসপাতাল। ১৮১৫ সালে ঢাকায় স্থাপিত পাগলা গারদে ২১৭টি পুরুষ ও ৪৫টি নারী আসন ছিল। এর অধিকাংশ রোগী ছিল কয়েদি।

১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র ঢাকা নয় বরং সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব বাংলার চিকিৎসা চাহিদা মেটাতে হাসপাতালটির সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। ১৮৯৫ সালে এখানে সেবা গ্রহণ করে ২৬,৯৭৯ জন রোগী ও ৪,০০৬টি অপারেশন সম্পন্ন হয়।[৩৯] চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে দেশীয়দের শিক্ষা প্রদানের জন্য ১৮৭৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল গড়ে ওঠে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারী যে বৈষম্যের শিকার হতো তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পর্দাপ্রথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লেডি ডাফরিন হাসপাতাল চালু করা হয় যেখানে ১৯০৪ সালে ৩৮ জন নারী রোগী ভর্তি হয়েছিল।[৪০]

নারায়ণগঞ্জে পাটকলগুলিতে কাজের জন্য ভারতের অন্যান্য স্থান হতে শ্রমিকরা আসত যা রোগ-ব্যাধি সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। ১৮৯২ সালে এখানে ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল স্থাপিত হয় ২০টি পুরুষ ও ১০টি নারী শয্যার সমন্বয়ে। ১৯০৭ সালে ৫৪০ পুরুষ, ১১১ জন নারী রোগী অভ্যন্তরীণ এবং ১৭,০০০ জন রোগী বহির্বিভাগীয় সেবা গ্রহণ করে।[৪১]

১৮৬০-এর দশকে সরকারের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ নীতির আওতায় গ্রামের মানুষকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে প্রত্যন্ত এলাকাতে ডিসপেন্সারি গড়ে তোলা হয়।[৪২] ঢাকা জেলার প্রথম ডিসপেন্সারি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে মানিকগঞ্জে। দুর্গম অবস্থান ও স্থানীয় কবিরাজের আধিপত্যের কারণে শুরুতে ডিসপেন্সারিতে রোগীর সংখ্যা কম হলেও পর্যায়ক্রমে তা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭১ ও ১৮৭২ সালে এখানে যথাক্রমে ২,৩৬২ ও ৩,৩৪৮ জন রোগী বহির্বিভাগীয় সেবা গ্রহণ করে। কালি নারায়ণ চৌধুরীর উদ্যোগে ১৮৬৬ সালে জয়দেবপুরে একটি ডিসপেন্সারি প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬ জন রোগী সেবা গ্রহণ করত। বন্য জীবজন্তুর আক্রমণজনিত চিকিৎসা পাওয়ার জন্য এই ডিসপেন্সারিটি থাকা প্রয়োজন বলে সরকারকে অবহিত করা হয়। বিক্রমপুরে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় জোঁসর ডিসপেন্সারি গড়ে ওঠে, যেখানে অনেক দূর-দূরান্তের রোগীরা চিকিৎসা-সেবা গ্রহণ করতে আসত। সাধারণত এখানে জ্বর,বাত, কাশি ও পেটের পীড়ার চিকিৎসা দেওয়া হতো।

এছাড়া ১৮৬৮ সালে ভাগ্যকুল ডিসপেন্সারি, ১৮৭১ সালে কালিপাড়া ডিসপেন্সারি এবং ১৮৭২ সালে বাবু ইশান চন্দ্র ভূষণ-এর দানকৃত অর্থে মালুচি ডিসপেন্সারি প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিসপেন্সারিতে দেশীয় ডাক্তার চিকিৎসা প্রদান করতেন এবং বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হতো। শুরুতে ডিসপেন্সারির চিকিৎসা নিতে স্থানীয়রা ইচ্ছুক ছিল না। যেমনটি কালিপাড়া ডিসপেন্সারি সম্পর্কে সিভিল সার্জন বলেন, "দেশীয় ডাক্তারগণ এই প্রতিষ্ঠানটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে অনেক

প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছে। এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ হওয়ায় তারা দেশীয় ডাক্তারের বদলে কবিরাজি চিকিৎসা নিতে অধিক আগ্রহী।"[৪৩] তবে ক্রমে ডিসপেন্সারি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দেখা যায়, ১৯০৭ সালের মধ্যে ঢাকা জেলায় ২২টি ডিসপেন্সারি গড়ে ওঠে যার ১৩টি জেলা বোর্ডের অধীনে ও বাকিগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হতো।[৪৪]

নিম্নের পরিসংখ্যান হতে লক্ষণীয় যে, ডিসপেন্সারিতে অভ্যন্তরীণ রোগীর তুলনায় বহির্বিভাগীয় সেবা গ্রহণের হার ছিল অনেক বেশি।[৪৫]

ডিসপেন্সারি	বহির্বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা	অভ্যন্তরীণ রোগীর সংখ্যা	ডিসপেন্সারি	বহির্বিভাগীয় রোগীর সংখ্যা	অভ্যন্তরীণ রোগীর সংখ্যা
মানিকগঞ্জ	২২৯৮	-	জোঁসর	৩৯০৮	-
ভাগ্যকুল	২৪৫২	-	মুন্সিগঞ্জ	২৩৪৮	২৯
নারায়ণগঞ্জ	৪০২২	৬০	জয়দেবপুর	২৬০৬	২২
মালুচি	৪৫০৪	১৪০	.....	.....	.....

মাত্র ৫টি ডিসপেন্সারিতে মোট ৫৯টি শয্যা ছিল অভ্যন্তরীণ সেবা প্রদান করার জন্য। অনেক ইংরেজ শাসকের মতে, শুধুমাত্র অভাবী রোগীরাই অভ্যন্তরীণ সেবা গ্রহণ করতে রাজি হতো তাই এই আসন সংখ্যা ছিল যথেষ্ট।[৪৬] যদিও এটি সত্য নয়, চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক কারণে ডিসপেন্সারিগুলিতে অভ্যন্তরীণ সেবা দেওয়া সম্ভব হতো না।[৪৭]

ভ্যাক্সিনেশন

১৮৬৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটি ছিল ভ্যাক্সিন-সম্পর্কিত উপমহাদেশের প্রথম বার্ষিক (annual) রিপোর্ট। বার্ষিক প্রতিবেদন ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে টিকা সম্বন্ধীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৮০৫ সালে ড. শুলব্রেড কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টটি সবচেয়ে পুরাতন।[৪৮] এছাড়া ১৮০৬ সালে উইলিয়াম রাসেল, ১৮২৯ সালে ড. ক্যামেরন, ১৮৪৪ সালে ড. ডানকান স্টুয়ার্ট কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টগুলি থেকে বাংলায় টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে জানা যায়।

১৭৯৮ সালে ড. জেনার গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেন এবং ১৭৯৯ সালে লন্ডনে টিকাদান কর্মসূচি চালু হয় যা ক্রমে ইউরোপসহ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮০১ সালে বোম্বের গভর্নর কনস্টান্টিনোপলের ব্রিটিশ দূত আর্ল অব এলগিনকে ভারতে ভ্যাক্সিন প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখেন, যার ভিত্তিতে ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বেতে টিকা পাঠানো হয়। ১৮০২ সালে মেডিকেল বোর্ড-এর সদস্য জন ফ্লেমিং গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলকে অবহিত করেন, হিন্দু মুসলিম ফিজিশিয়ানদের সমন্বয়ে উপসর্গ দেখে প্রকৃত রোগ নির্ণয়, সাব-স্টেশনগুলিতে টিকার সরবরাহ অব্যাহত রাখা ইত্যাদি বিষয়সমূহ তদারকির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একজন সার্জন নিয়োগ করা প্রয়োজন। তাছাড়া স্থির করা হয় যে, প্রতিটি স্টেশনে একজন ইউরোপীয় সুপারিনটেনডেন্ট-এর তত্ত্বাবধানে দেশীয় টিকাদাররা টিকা প্রদান করবেন।[৪৯] টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

ব্রিটিশ অধিকৃত এলাকাসমূহকে ৭টি সার্কেলে বিভক্ত করা হয়, যেখানে ঢাকা ছিল ইস্টার্ন বেঙ্গল সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত।[৫০]

১৮০৫-১৮০৬ সালে ঢাকায় উইলিয়াম টিউটিনের তত্ত্বাবধানে টিকা প্রদানের পরিসংখ্যান ছিল নিম্নরূপ:[৫১]

সাল	সুপারিনটেনডেন্ট	খ্রিস্টান	মুসলমান	হিন্দু	মোট
১৮০৫	উইলিয়াম টিউটিন	-	৩২২	২১৮২	২৫০৪
১৮০৬	উইলিয়াম টিউটিন	১	১৮৫	২১০	৩৯৬
	এ. ওগিলভি	৮	৮৬০	৬৯৭	১৩৬৫

সাধারণত কুমার, শাখারি, আচার্য ও নিম্নবর্গীয় ব্রাহ্মণ টিকাদার হিসেবে কাজ করত। বৈদ্যরা টিকা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত হয়নি, কারণ রক্ত পুঁজ ইত্যাদি স্পর্শ করতে হতো যার ফলে তাদের জাত চলে যাওয়ার ভয় ছিল। এছাড়া মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে টিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। ১৮৮৬ সালে প্রথমবারের মত মহিলাদের টিকা দেওয়ার জন্য একজন নারী টিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয় যদিও তার কাজ কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল।[৫২] ১৮২৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৮২৯ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত ঢাকায় ভ্যাক্সিন প্রদানের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:[৫৩]

সুপারিনটেনডেন্ট	খ্রিস্টান	হিন্দু	মুসলমান	মোট টিকাপ্রাপ্ত জনসংখ্যা
মি. জিও ল্যান্ড	৮	৮০৫	৫৮৭	৩১৩৯
দেশীয় টিকাদার	০	১,২২২	৫১৭	

১৮০৫-১৮০৬ ও ১৮২৮-১৮২৯ সালের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে টিকা গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা, চাকুরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেমন মুসলমানরা পিছিয়ে ছিল, টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে সেই একই চিত্র দৃশ্যমান। ইংরেজ শাসকের প্রতি অবিশ্বাস, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। অবশ্য ঢাকার মোট জনসংখ্যার তুলনায় টিকাপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। শুধু ঢাকায় নয়, সমগ্র বাংলায় পুরো ভ্যাক্সিনেশন প্রক্রিয়াটি ছিল ধীর গতির। গরুর শরীর থেকে কৃত্রিমভাবে তৈরি বসন্ত রোগের জীবাণু নিয়ে ভ্যাক্সিন উৎপাদিত হতো বলে ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে অনেকে টিকা নিতে চায়নি। এ অঞ্চলে বৈষ্ণব হিন্দু ও ফরায়েজি মুসলমান টিকাদান কর্মসূচির তীব্র বিরোধীতা করে।[৫৪]

পাশাপাশি শিশুদের টিকা প্রদানকে অভিভাবকেরা ভালভাবে গ্রহণ করেনি। তারা সন্তানকে লুকিয়ে রাখত। কারণ তারা মনে করত টিকা দিলে শিশুর রোগ হবে। দেখা গেছে, টিকা দেওয়ার কয়েকমাস পর অন্য কোন কারণে শিশু মারা গেলেও টিকাদানকে দায়ী করা হতো।[৫৫] ভ্যাক্সিনেশনের ধীর অগ্রগতি নিয়ে জন শুলব্রেড উল্লেখ করেন,

> The apathy of the natives who are at all time averse to innovation, and indifferent to improvement, and the prejudices against the vaccine disease assiduously excited in their minds by the persons employed in small pox inoculation, are the chief causes of the slow progress it has made in this country.[৫৬]

তবে এ অবস্থার পরিবর্তনে ও টিকা কার্যক্রমে সাফল্য আনয়নে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৭০ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল টিকা প্রদানে এক বিশেষ অভিযান চালু করে, ফলে অনেক মানুষ মৃত্যু থেকে রক্ষা পায়।[৫৭] ১৯০৩-০৪ সালে ঢাকায় ৯৫,০০০ জনকে টিকা দেওয়া হয়। এবছর টিকা গ্রহণের হার ছিল প্রতি ১০০০ জনে ৩৭.৩ জন।[৫৮]

সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ উদ্যোগ

শুরুর দিকে যথাযথ সচেতনতা, শিক্ষার অভাবের ফলে এদেশীয় জনগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। অনেক সময় রোগ-ব্যাধি, মহামারির জন্য তারা ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করতে থাকে। বিশেষত উনিশ শতকে ম্যালেরিয়ার জন্য রেলপথ নির্মাণকে ব্যাপকভাবে দায়ী করা হয়। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মনে করত, ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাদের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা কে অবজ্ঞা করেছে; ফলে বাংলায় ব্যাপক আকারে কলেরা রোগের বিস্তার ঘটেছে। একারণে দেখা যায়, কলেরা মহামারির সময় ডাক্তারি নির্দেশনার বদলে ওলা চান্দি বা ওলা বিবির পূজা করা হতো।[৫৯]

রোগ নিরাময়ে এদেশীয় জনগণ অনেক ভ্রান্ত চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করত। যেমন, ৪০ বছরোর্ধ ব্যক্তি কলেরা, আমাশয় ও ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আফিম সেবন করত। মায়েরা শিশুদের ১৪তম দিন থেকে ৩ বছর পর্যন্ত স্বল্প পরিমাণে আফিম খাওয়াত, কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল এটি ডায়রিয়া প্রতিরোধ করবে।[৬০]

হাকিম ও বৈদ্যের এদেশের আবহাওয়া, রোগ ও ওষুধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইংরেজ ডাক্তারদের তুলনায় অধিক থাকায় তাদের ওষুধ বেশি কার্যকরি এমন বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঢাকার অধিবাসীরা তাদের চিকিৎসা নিতে আগ্রহী ছিল। তবে দেরিতে হলেও মানুষ আধুনিক চিকিৎসা সেবার সুফল পেতে থাকে। মিটফোর্ড হাসপাতাল, ডিসপেন্সারিগুলির রোগীদের পরিসংখ্যান দেখলে তা স্পষ্ট হয়। ঢাকাবাসী ও ইউরোপীয় জনগোষ্ঠী উভয়ের মধ্যে ডাক্তার সমাদৃত হয়েছিলেন। ঢাকার জমিদার গণি মিয়ার অন্দরমহলে তিনি মহিলা রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা রোগ নিরাময়ে ডাক্তারের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন।[৬১]

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উনিশ শতকে ঢাকা জেলার জনস্বাস্থ্যকে দুটি আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঢাকা নগরীর পতনের ফলে শিল্প, বাণিজ্যের ন্যায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও দুর্দশা নেমে আসে। এসময় রোগ-ব্যাধি মহামারি থেকে সুরক্ষার জন্য হাকিম,

কবিরাজি চিকিৎসার পাশাপাশি ঢাকাবাসী বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঢাকার পরিবেশ ও স্বাস্থ্য উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, কেননা সরকার প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে ছিল না এবং যেকোন উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের যা ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিপন্থি।

এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা ও ঔষুধ ঢাকাবাসীর জীবনে এক নতুন সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টি করে। মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠা ঢাকার সাধারণ মানুষের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে ছিল মাইলফলক স্বরূপ। একথা সত্যি যে, ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষায় আধুনিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, তবে ক্রমে এর সুফল ঢাকাবাসী পেতে থাকে। বিভিন্ন রোগের উৎস ও প্রতিকার নির্ণয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা, আধুনিক চিকিৎসা সম্বলিত হাসপাতাল, ভ্যাক্সিনেশন প্রভৃতি রোগ-ব্যাধি ও মহামারির প্রকোপ হ্রাসে সহায়তা করে।

তবে জনস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যেকোন উদ্যোগ ছিল ঢাকার জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া নগরীতে নানাবিধ উন্নয়ন হলেও গ্রামীণ ঢাকার মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল প্রধানত পুরাতন নির্ভর। ফলে দেখা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা সেবা প্রদানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হলেও বিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত এটি সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে প্রবেশ করেনি।

তথ্যনির্দেশ

১. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, চয়নিকা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৬৮
২. যতীন্দ্রমোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, যামিনী মোহন কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃ. ৮
৩. Taylor James, *A sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Military Orphan Press, Calcutta, 1840, p. 2
৪. Beverley H., *Report on the Census of Bengal 1872*, Statistical Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872, Appendix C, p. XIV
৫. *Imperial Gazetteer of India: Eastern Bengal and Assam*, Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1909, p. 300
৬. *Life in the Mofussil or The Civilian in Lower Bengal*, Ex-Official, C. Kegan Paul and Co., London, 1878, p. 84
৭. *Statistics of the Lower Provinces of Bengal for 1868-69*, Boards Return No-41B, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872, p. 32
৮. Rizvi S.N.H, *East Pakistan District Gazetteers: Dacca*, East Pakistan Government Press, Dacca, 1969, p. 159
৯. Hossain Syud, *Echoes from Old Dacca*, The Edinburgh Press, Calcutta, 1909, p. 22
১০. *Life in the Mofussil or The Civilian in Lower Bengal*, op. cit, p. 84
১১. আবদুল মমিন চৌধুরী ও শরীফ উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), *রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর ও উত্তর কাল* (প্রথম খণ্ড), *রাজনীতি সমাজ প্রশাসন*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫১-৫২

১২. *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* Alipore Jail Press, Calcutta, 1869, p. 98
১৩. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ১, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ২৯১
১৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৭০
১৫. *Bengal District Gazetteer, B Volume, Dacca District*, Statistics 1900-01 to 1910-11, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1914, p. 7
১৬. Kazi Ihtesham, *Historical Study of Malaria in Bengal 1860-1920*, Pip International Publications, Dhaka, 2004, p. 97
১৭. Jackson Charls Julian, *Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for the Year 1873*, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1874, p. 100
১৮. Smith David B., Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for the Year 1870-71, Bengal Secretariat Press, Calcutta 1872, p. 16
১৯. Clay Arthur L., *Leaves from a Diary in Lower Bengal*, Macmillan and Co., London 1896, p. 148
২০. *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* op.cit. p.103
২১. *Life in the Mofussil or The Civilian in Lower Bengal*, op. cit., p.197
২২. Jackson Charls Julian, op. cit., p. 33
২৩. Taylor James, op. cit., p. 330
২৪. *Ibid*, 334
২৫. *First Annual Report of the Sanitary Commission for Bengal, 1864-65*, Presented to the Parliament by Her Majesty's Command, 28 February 1866, p. 2
২৬. Buckland C. E., *Bengal under the Lieutenant-Governors,* Vol. I, S. K Lahiri & Co. Calcutta, p. 419
২৭. বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৯৬-২৫৬
২৮. *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* op.cit., p. Appendix E, XIIII
২৯. *Ibid, 101*
৩০. *Ibid*, 102
৩১. Allen B.C., *Eastern Bengal District Gazetteers: Dacca,* The Pioneer Press, Allahabad, 1912, p. 80-81
৩২. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ২, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৯
৩৩. Smith David B., *Eleventh Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal 1878*, Calcutta, The Bengal Secretariat Press, 1878, p. 37
৩৪. 'The Provisions of Water Supply and Sanitation in Dhaka up to 1971', A K M Golam Rabbani, *400 Years of Capital Dhaka and Beyond,* Vol III, Roxana Hafiz and A K M Golam Rabbani (Ed.), Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2011, p. 370
৩৫. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা সমগ্র* ১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮
৩৬. যতীন্দ্রমোহন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬
৩৭. *Report on the Working of Municipalities in Bengal, 1894-95*, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1895, pp. 188-89
৩৮. *Report on Sanitary Measures in India in 1889-90,* Vol. XXIII, Eyre and Spottiswoode, London, 1891, p. 37

৩৯. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*, একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৪-১০৬
৪০. পাপড়ীন নাহার, "উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নারী-স্বাস্থ্য", প্রকাশিত হয়েছে সোনিয়া নিশাত আমিন (সম্পাদিত), *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১৬
৪১. Allen B.C., op. cit., p.76
৪২. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৪৩. Hunter, W W., *Statistical Account of Bengal,* Vol. v, D K Publishing House, Delhi, 1973 (reprint), pp. 12-53
৪৪. Allen B.C., *op. cit*., p. 76
৪৫. Payne A. J., *Report on the Charitable Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1880,* Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1881, p. 29
৪৬. Allen B.C, *op. cit*., p.77
৪৭. Hunter W W, *op. cit*. p. 153
৪৮. Murray J. *Report on Vaccination Proceedings*, Government of Bengal, Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1869, p. XI
৪৯. Shoolbred John, *Report on the Progress of Vaccine inoculation in Bengal*, Blacks and Parry, London 1805, pp. 3-7
৫০. Lidderdale R., *Nineteenth Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal, 1886,* Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1887, Section-VII, p. 53
৫১. Russell William, *Report on the State and Progress of Vaccination in Bengal during the years 1805 and 1806*, The Honorable Company's Press, Calcutta, 1806, pp. 5, 9
৫২. Lidderdale R., op. cit., Section-VII, p. 66
৫৩. Cameron William, *Report on the Present State of vaccine inoculation in Bengal*, The Baptist Mission Press, Calcutta,1831, p. 20
৫৪. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *ঢাকা: ইতিহাস ও নগর জীবন (১৮৪০-১৯২১)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২
৫৫. *Small Pox and Vaccination in British India,* The National Anti Vaccination League, London, 1911, p. 49
৫৬. Cameron William, op. cit., p. 10
৫৭. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
৫৮. *Imperial Gazetteer of India: Eastern Bengal and Assam,* op.cit., 1909, p. 310
৫৯. Arnold David, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic disease in Nineteenth-century India,* University of California, 1993, pp. 171-172
৬০. *First Annual Report of the Sanitary Commissioner for Bengal for 1868,* op.cit. p.101
৬১. আর্থার লয়েড কে, ঢাকা ক্লের ডায়েরী, রূপান্তর ফওজুল করিম, সম্পাদনা মুনতাসীর মামুন, ঢাকা নগর যাদুঘর, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ৪৬

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলা: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সঞ্জয় বিক্রম*

সারসংক্ষেপ

উপনিবেশায়িত ভারতবর্ষে সিরাজদ্দৌলাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল নারীলোলুপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত, বদমেজাজি, মূর্খ ও নৃশংস চরিত্র হিসেবে। ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এমন মিথ্যা আখ্যান তৈরির প্রধান কারণ ছিল। উপনিবেশায়িত মন এরূপ মিথ্যা কাহিনিতে আচ্ছন্ন ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রথম সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমোচনের কাজটি যত্নসহকারে সম্পন্ন করেছিলেন। তারপরে বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীর হিসেবে উপস্থাপন করার প্রবণতা শুরু হয়। কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে এক এক জন নাট্যকারের হাতে সিরাজদ্দৌলা চরিত্র কম-বেশি নতুনরূপে উপস্থাপিত হতে থাকে। এই পরিবর্তন নাট্যকারদের সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে জারিত করে অগ্রগামী হয়েছে। একই ঐতিহাসিক চরিত্রকে নিয়ে লেখা হলেও ভিন্ন কালে ভিন্ন নাট্যকারের নাটকে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র-আখ্যানের পার্থক্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সময়ের ব্যবধানে বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলার যে চরিত্র ও আখ্যান নির্মিত হয়েছে, তা ইতিহাস থেকে খানিক দূরবর্তী হয়ে পড়েছে।

ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের জন্য সিরাজদ্দৌলা[১] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পরাজয়ের পর শাসনব্যবস্থাকে পাকা ভিত্তি দিতে ইংরেজরা এই ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে নিজেদের ঈপ্সিত বাসনা অনুযায়ী রূপায়ণ করেছিল। নির্মিত কলঙ্কিত এই আখ্যানকে তারা উপনিবেশায়িত ভারতবর্ষের জনমনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। উপনিবেশায়িত মন তাদের বয়ানকে দ্বিধাহীনভাবে প্রায় দেড়শ বছর সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া জোরালো হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের সময়কাল থেকে। এ সময় পলাশির ইতিহাসকে ইংরেজদের চোখে না দেখে সত্য অনুসন্ধানের প্রয়াস শুরু হয়। লিখিত হয় সিরাজদ্দৌলার নতুন ইতিহাস। 'সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপচিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন।'[২] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়(১৮৬১–১৯৩০) *সিরাজদ্দৌলা* (১৮৯৭) নামক ইতিহাসগ্রন্থে ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, দুরাচার ও ইন্দ্রিয়বিলাস নয়, সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ রাজন্যবর্গের ষড়যন্ত্র তথা তাঁর দুর্ভাগ্য। তিনিই প্রথম, জাতীয়তাবাদের প্রেরণাদায়ী, ঐতিহাসিক জাতীয় বীর হিসেবে, সিরাজদ্দৌলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নব্য নির্মিত সেই ইতিহাসকে বাঙালির প্রেরণার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হলেন স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি সাহিত্যিকেরা। উপর্যুক্ত ঐতিহাসিকদের সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের পুনর্নির্মাণের পর, বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলা জাতীয় বীর হিসেবে আবির্ভূত হন। তাঁকে নিয়ে নাটক লেখেন অনেকেই।[৩]

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

তাঁদের মধ্যে চার ভিন্ন কালপর্বের চারটি নাটক এখানে আলোচনায় রাখা হয়েছে।[৪] নাটক চারটি হল–

ক. গিরিশচন্দ্র ঘোষ : *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬)
খ. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮)
গ. সিকান্দার আবু জাফর : *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫)
ঘ. সাঈদ আহমদ : *শেষ নবাব* (১৯৮৯)

গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪–১৯১২) *সিরাজদ্দৌলা* (১৯০৬) এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াস। স্বদেশী আন্দোলন তাঁকে এই ঐতিহাসিক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত ক্রমশ দুর্বল হতে থাকলে শাসকপক্ষ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে তাদের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতির সার্বিক প্রয়োগ করে। অবধারিত ফল হিসেবে ভারতের সংখ্যাগুরু দুই ধর্মীয় সম্পদায়ের (হিন্দু ও মুসলমান) মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এবারও জাতীয় ঐক্য টিকিয়ে রাখার আদর্শ নিয়ে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২–১৯৬১) *সিরাজদ্দৌলা* (১৯৩৮) নাটক লিখলেন। তবুও ভারত ভাগ হল। ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া নব্য গঠিত পূর্ব বাংলায় সিরাজদ্দৌলাকে নতুন করে নির্মাণের চেষ্টা করলেন সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫)। লিখলেন *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫) নাটক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই সিরাজদ্দৌলাকে নিয়েই লেখা হয় সাঈদ আহমদের (১৯৩১–২০১০) *শেষ নবাব* (১৯৮৯) নাটকটি। চার কালপর্বে লেখা এই নাটকগুলোতে সিরাজদ্দৌলাকে দেখানো হয়েছে জাতীয় বীর হিসেবে। তা সত্ত্বেও তাঁদের নির্মিত সিরাজদ্দৌলা অভিন্ন থাকেন নি। চারজনের নির্মিত চরিত্রটি তাঁদের নিজ নিজ সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রভাবজাত এবং তাঁদের ব্যক্তিগত আদর্শের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্বতন্ত্র। নাটক চারটির মধ্যে জাতীয় বীর হিসেবে সিরাজদ্দৌলাকে পরিশোধিত করার একটি ক্রমধারাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই একই কারণে ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলার সাথে বাংলা নাটকের সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের দূরত্বও বেড়ে গেছে।

ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলা

উনিশ শতকের শেষপাদে এসে ভারতীয় উপমহাদেশীয়দের স্বদেশী ইতিহাসের দিকে নতুনভাবে দৃষ্টিপাত করার প্রবণতা শুরু হয়। এর আগ পর্যন্ত ইংরেজ কিংবা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতাপুষ্ট ঐতিহাসিকদের সিরাজ-কেন্দ্রিক ইতিহাসে, জ্ঞানে-অজ্ঞানে মেনে নেয়া ভারতীয় বুদ্ধিজীবী তথা সাধারণের কাছে, সিরাজদ্দৌলা ছিলেন এক কলুষিত চরিত্র। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রথম ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এর আগ পর্যন্ত সিরাজদ্দৌলা সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল–

> গর্ভস্থ সন্তান কিরূপে বাস করে তাহা দেখিবার জন্য গুর্ব্বিণীর উদর বিদীর্ণ করিত, রাজপ্রাসাদে বসিয়া মুমূর্ষুর অঙ্গবিক্ষোভ দেখিয়া আনন্দলাভের জন্য নৌকামধ্যে নরনারী আবদ্ধ করিয়া নিমজ্জিত করিবার আদেশ দিত; কক্ষমধ্যে উপপত্নীগণকে ইষ্টকদ্বারা জীবিতাবস্থায় সমাধি-নিবদ্ধ করিত; মাতার পরপুরুষ-সম্ভোগের প্রতিশোধ লইবার জন্য রমণীমাত্রেরই সতীত্বনাশ করিত; তরবারী ও বর্ষাধারিণী তাতার, জর্জ্জিয়া ও হাবসীদেশের রমণীগণকে অন্তঃপুরের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত রাখিত; মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথে নরহত্যা করিত; বহু রমণী

> সম্ভোগ করিয়া এবং নরহত্যার পুণ্যলাভ করিয়া মহম্মদের মতের প্রধান দুইটী উপদেশ পালন করিয়া মোসলমান চরিত্রের আদর্শরূপে প্রতিভাত হইত।[৫]

গভর্নর রজার ড্রেক 'স্বকীয় কলঙ্কমোচনের আশায়' এসব মিথ্যাচার করে গেছেন।[৬] উত্তরকালে ইংরেজ মানসিকতাপুষ্ট ঐতিহাসিকদের প্রচারণায় তা আরও বলবৎ হয়েছিল। হলওয়েল, স্যার জন ম্যাল্‌কম, ক্লাইভ, স্টুয়ার্ট, লর্ড মেকলে, হিলস্ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও এই সকল মিথ্যাচারের জন্য যে কম-বেশি দায়ী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দৃষ্টান্ত দিয়ে তা প্রমাণ করেছেন। এই জনশ্রুতি এতটাই প্রবল ছিল যে, দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯–১৮৭৩) তাঁর *সুরধুনী কাব্যে* (১৮৭১), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭–১৯০৯) *পলাশির যুদ্ধ* (১৮৭৫) কাব্যে অনুরূপ সিরাজদ্দৌলাকে চিত্রিত করেছেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৪০–১৯০১) *পলাশির যুদ্ধ* কাব্যের নাট্যরূপ দিলে তৎকালে সিরাজদ্দৌলা রঙ্গমঞ্চে বীভৎস কলঙ্কিত হিসেবেই উপনীত হন। অথচ–

> সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ যে সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ আছে; কিন্তু গুর্ব্বিণীর গর্ভবিদারণ, নৌকা সহিত ভাগীরথীগর্ভে নরনারী-নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচারের কোনও উল্লেখ নাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার অধিকাংশই "রচা কথা"।[৭]

সিরাজদ্দৌলাকে নিকৃষ্ট চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করার জন্য প্রথম যে অপবাদ চাপানো হয়, তা হল তাঁর ইন্দ্রিয়লালসার কুৎসা। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর গ্রন্থের 'ইন্দ্রিয়-বিকার' পরিচ্ছেদে সিরাজদ্দৌলার প্রথম বয়সের চারিত্রিক স্খলনের কথা মেনে নিয়েছেন। তবে তিনি দেখিয়েছেন, এ-জন্য তাঁর চেয়ে তাঁর মদদদাতারা বেশি দায়ী ছিল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এরূপ আচরণ যুবরাজের পক্ষে তেমন দোষণীয় ছিল না। তবে এক্ষেত্রে ইংরেজদের 'সদিচ্ছা'য় রটনা তিলকে তাল করে তুলেছিল। 'জমিদারদিগের আতঙ্ক' পরিচ্ছেদে তিনি অবশ্য রানী ভবানীর একমাত্র বিধবা কন্যা তারার প্রতি সিরাজদ্দৌলার আসক্ত হয়ে পড়ার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি দেখিয়েছেন যে, রাজকার্যে লিপ্ত হওয়ার পর সিরাজদ্দৌলা আর কখনই আগের বিলাসী জীবনে ফেরেননি। বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম উপদেশ মেনে তিনি একজন নিষ্ঠ নবাবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করতে দ্বিতীয় অপপ্রচার হল 'অন্ধকূপ হত্যা'র বানোয়াট কাহিনি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের পূর্বেই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫–১৮৮৬) অংশত সিরাজদ্দৌলাকে 'অন্ধকূপ হত্যা'র দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[৮] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এ-বিষয়ে সিরাজদ্দৌলার দায় নিয়ে আলোচনা করে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৯] ব্রিটিশ স্বার্থে প্রণীত ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে আর একটি বড় অপবাদ তাঁর অপরিণামদর্শিতা, অজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞানের অপূর্ণতা। নানান সময়ে লেখা সিরাজদ্দৌলার পত্রের বক্তব্য ও ভাষা বিচার করে এবং নানা সময়ে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এমন অপবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় "Shirajuddaulah was more unfortunate then wicked"। গ্রন্থের উপসংহারে এসে তিনি বলেন–

> কেবল ঘটনাবিবৃতির জন্য যে সকল ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলার অন্যায় উৎপীড়নেই তাঁহার অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। কার্য্য-কারণের সমালোচনা করিয়া, নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস সঙ্কলন করিলে, তাহাতে সকলকেই দেখিতে হইবে,– এই হতভাগ্য নরপতির অযথা-

> কলঙ্কিত তরুণজীবনের অত্যাচার অবিচার উপলক্ষমাত্র; আমাদের চরিত্রহীনতাই মোঘল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ।[১০]

তাঁর লিখিত ইতিহাসকেও উত্তরকালে অল্প-বিস্তর পক্ষপাতের দোষে দোষী করা হয়েছে। 'অক্ষয়কুমারের আগে এভাবে কেউ সিরাজের পক্ষ সমর্থন করেছেন বলে জানা নেই।'[১১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *সিরাজদ্দৌলা*কে নিয়ে মুগ্ধ ছিলেন। তবুও তিনি এই দিকটির সমালোচনা করেছেন। বলেছেন– 'কেবল একটা বিষয়ে তিনি ইতিহাস-নীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যদিচ সিরাজ-চরিত্রের কোনো দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করেন নাই, তথাপি কিঞ্চিৎ উদ্যম-সহকারে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।'[১২] উনিশ শতকের শেষপাদে এই পক্ষপাত জরুরি ছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশে ইতিহাসের এমন পুনঃপাঠের আবশ্যকতা ছিল। তাঁর গ্রন্থে সেকালে হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিরোধের কোন উল্লেখ নেই। বরং হিন্দু বিত্তশালীদের শাসনক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপ ও রাজভবনে উচ্চবর্গ হিন্দুদের অবস্থান, সেসময়ের হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানের কথাই প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে মূল দ্বন্দ্ব ছিল ব্যক্তিস্বার্থের। সমাজের বিত্তশালীদের একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বে পড়ে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ঘটেছিল। তৎকালে হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের কথা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরাও মেনে নিয়েছেন।[১৩] সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীর হিসেবে উপস্থাপন করতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের যেটুকু পক্ষপাতিত্বের কথা বলা হয়, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষপর্বে তা সময়োপযোগী ছিল। তাঁর প্রচেষ্টা সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসকেই বদলে দিয়েছিল প্রায় বিপরীত অর্থে।

এক

"১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে অবিস্মরণীয় 'স্বদেশী আন্দোলন' গড়ে ওঠে, দেশপ্রেমের সেই উত্তাল জোয়ারের দিনে গিরিশচন্দ্র 'সিরাজদ্দৌলা' রচনা করেন।"[১৪] দেশাত্মবোধের প্রেরণা নিতেই নবাব সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীর হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁর নাটকে–

> একদিকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ ঐতিহাসিক প্রদত্ত ও নির্দেশিত তথ্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, অন্যদিকে 'স্বদেশী আন্দোলন' যুগের বৃটিশ-বিরোধিতা ও হিন্দুমুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শকে নাটকের মধ্যে যুগোচিত রূপ দিয়েছেন।[১৫]

অর্থাৎ তিনি নাটক রচনা করতে গিয়ে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের মত মেনে নিয়েছেন এবং প্রেরণা হিসেবে সমকালীন জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর লিখিত নাটকটি ঘটনা-উপস্থাপনধর্মী দীর্ঘ রচনা। তিনি মনে করতেন 'আলিবর্দীর সময় হইতে সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় পরিণাম পর্যন্ত যে সকল স্বার্থচালিত ঝঞ্ঝাপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহে বঙ্গ-সিংহাসন আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ চিত্র-প্রদর্শন ব্যতীত সিরাজদ্দৌলা নাটক প্রস্ফুটিত হয় না।'[১৬] তাই তাঁর নাটকে ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনা বর্তমান। কেউ পূর্ব ইতিহাস না জেনেও নাটকটির বক্তব্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবে। নব নির্মিত সিরাজদ্দৌলার জন্য এমন বর্ণনা কার্যকর ছিল।

পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত নাটকটির সূচনা হয় মতিঝিল প্রাসাদ থেকে সুকৌশলে খালা ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দি করার মধ্য দিয়ে। ঘসেটি বেগম 'পতিহীনা, অসহায়া রমণী' হলেও পালিতপুত্র

এক্রামদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানোর চক্রান্তে লিপ্ত। সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল জেনে সওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করে। সওকতজঙ্গ ইন্দ্রিয়াসক্ত। মদ আর নারী তার প্রধান আকর্ষণ। তার বুলি, 'ভাল ভাল মেয়েমানুষ আমার শ'খানেক চাই'।[১৭] এমন অকর্মণ্য লোককে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে এক হয়ে যায় বিত্তবান ও অমাত্যশ্রেণির বড় অংশ। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে জগৎশেঠ দিল্লি থেকে সওকতজঙ্গের নামে নবাবী সনদ এনে দেয়।[১৮] স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতকরণ, নবাবী সনদ আনয়ন, সংকটে পরামর্শ, বিপদে সাহায্য ইত্যাদি কাজে শেঠরা ছিল সে সময়ের রাজশক্তির বড় হাতিয়ার। জগৎশেঠের কুচক্র বুঝতে পেরে সিরাজদ্দৌলা তাকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দেন এবং তিন কোটি মুদ্রা দাবি করেন।[১৯] এ ঘটনায় তখনই মীরজাফরসহ অনেকে অস্ত্র ত্যাগ করে নবাবের এহেন আচরণের প্রতিবাদ করে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ দেখাচ্ছেন, ঠিক সে মুহূর্তে নবাব-মহিষী (আলিবর্দীর সহধর্মিণী) এসে সমস্যার সমাধান করে দেন–

> রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত। এ সঙ্কট সময়ে এ বালককে পরিত্যাগ করবেন না। ঘোর বিপদ হতে বালককে উদ্ধার করুন। সিরাজ যদি অমর্য্যাদাসূচক কথা ব'লে থাকে, আমি নবাব-মহিষী, সিরাজের পক্ষে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা ক'চ্ছি, বালকের অপরাধ বিস্মৃত হোন।[২০]

এই নাটকে তার প্রভাব অনেক। পলাশী যুদ্ধের আগে সে মীরজাফরের কাছে সিরাজদ্দৌলাকে সমর্পণ করে রক্ষার ভার দেয়। মূল ক্ষমতা যেন তার হাতেই ন্যস্ত। ইতিহাসে এ-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তবে অল্পবিস্তর প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

সওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাতে ব্যর্থ হওয়ার পর ষড়যন্ত্রকারীদল চুপ করে থাকেনি। কেননা, তাদের প্রত্যেকের স্বার্থ আলাদা হলেও সকলের স্বার্থই সিরাজদ্দৌলার কারণে হুমকির সম্মুখীন। তাই তারা ইংরেজদের বেছে নেয়। লিপ্ত হয় পলাশির প্রান্তরে যুদ্ধাভিনয়ের মাধ্যমে সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটাতে।

> যাঁহারা গুপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের জন্য বা দশের জন্য চিন্তা করিতেন না– জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীরজাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কায়স্থ দুর্ল্লভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ,– ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও শোণিতসংস্রব বা স্নেহবন্ধন ছিল না; কেবল স্বার্থরক্ষার জন্যই একে অপরের পৃষ্ঠরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইয়াছিলেন।[২১]

তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ষড়যন্ত্রকারীদের উপস্থাপন করেছেন ভীত-সন্ত্রস্ত হিসেবে। তারা যেন সর্বদা নবাবের ভয়ে জড়সড়। জগৎশেঠের বাগানবাড়িতে হঠাৎ সিরাজদ্দৌলার আগমনে মীরজাফর ভীত হয়ে বলছে–

> সর্ব্বনাশ উপস্থিত; নবাব নিশ্চয় আমার বিশেষ অনিষ্টের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হবে। মীরমদন প্রভৃতির কুমন্ত্রণায় বুঝি বা প্রাণবধের আদেশ দেবে। আমি এই রাত্রেই মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করে ইংরাজের শরণাপন্ন হই, নচেৎ আর নিস্তারের উপায় নাই।[২২]

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অন্যতম একটি দিক অপপ্রচার। এই নাটকে কাজটি করছে জহরা ও দানসা। দানসা ফকির। কোন কোন ঐতিহাসিক দানসার কথা বললেও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমাণ করেছেন যে, সে সময়ে দানসা নামের ফকির জীবিত ছিল না। নাটকে দানসা নবাবের নামে কুৎসা রটনা করে, নাটকের শেষে সে-ই সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়ে দেয়। আর তাকে

অর্থলোভে প্রলুব্ধ করে জহরা। জহরা কাল্পনিক চরিত্র। নাটকে তাকে দেখানো হয়েছে সিরাজের হাতে নিহত[২৩] হোসেনকুলি খাঁয়ের প্রতিহিংসাপরায়ণ স্ত্রী হিসেবে। সে অবলীলায় নবাবের মহল, ইংরেজ শিবির, যুদ্ধক্ষেত্র সবখানে প্রবেশ করে। নাটকের ঘটনা তার ইঙ্গিতেই সংঘটিত হয়। কাল্পনিক চরিত্রের এরূপ সক্রিয়তা ঐতিহাসিক রস আস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীদের ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠেছে। আর একটি কাল্পনিক চরিত্র হলো কামিনীকান্ত। নাটকে তার পরিচয় করিম-চাচা বলে। সিরাজদ্দৌলার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা সে। নাট্যিক চরিত্র হিসেবে অনন্য হলেও ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের ভূমিকাকে সেও কিছুটা আড়াল করে দিয়েছে। সিরাজদ্দৌলার নামে মিথ্যা রটনার মধ্যে কথিত সকল বিষয়ই এনেছেন নাট্যকার। স্বাভাবিকভাবেই তারাবাঈয়ের প্রসঙ্গও এসেছে (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই সংক্রান্ত ঘটনার আংশিক সত্যতা স্বীকার করেছেন)। ইংরেজপক্ষীয় ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর দিকে নাট্যকার বিশেষ মনোযোগ দেননি। তিনি তা আবশ্যকও মনে করেননি। কেবল ইংরেজপক্ষ যে ষড়যন্ত্রে ভর করে পলাশির প্রান্তর পর্যন্ত আসতে সাহস করেছে, তা দেখানোর জন্য যতটুকু দরকার, তাদের চরিত্রের বিকাশ তার মধ্যেই সীমিত। কেননা, তিনি মূলত দেখাতে চেয়েছেন যে, নবাবের পরাজয়ের মূল কারণ দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থমূলক ষড়যন্ত্র। যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভকে উদ্দেশ্য করে তাই জহরাকে বলতে শুনি–

> সকলেরই মনোগত কিসে রাজ্য করগত হবে! রাজ্য করগত করা, রাজ্যের মঙ্গলার্থে নয়; দুর্দ্দান্ত নবাবকে দমন করবার জন্য নয়, প্রজার শান্তির জন্য নয়– স্বার্থের জন্য। যদি না স্বার্থপর হ'তো, তুমি সকলের চক্ষে ধূলি দিয়ে, প্রতারিত ক'রতে পারতে না।[২৪]

সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার নবাবী গুণ যা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ষড়যন্ত্র ও নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিতি। চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকট হয়ে ওঠেনি। নাটকে মনে হয়েছে, তাঁর কথা যেন কেউ মানছে না। কেবল তাঁর গোঁয়ার্তুমিকে ভয় করছে মাত্র। যুদ্ধের আগে কোরান স্পর্শ করে সিরাজদ্দৌলার পক্ষে মীরজাফরের প্রতিশ্রুতি, যুদ্ধের ময়দানে নবাবের মাথার মুকুট মীরজাফরের পায়ের কাছে রেখে বিশ্বস্ত রাখার যে চেষ্টা, তা ইতিহাসসিদ্ধ। তবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কাল্পনিক জহরা চরিত্রের মন্ত্রণায় নবাবের মুর্শিদাবাদ গমন, তথা কাল্পনিক করিম চাচার সাথে পোশাক বদল করে মুর্শিদাবাদ থেকে পলায়ন ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলা চরিত্রকে ক্ষুণ্ন করেছে। পলায়ন-পরবর্তী নবাবকে বন্দি করা ও তাঁকে হত্যা পর্যন্ত যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা দর্শকের মনে করুণ রসের প্রবাহ তৈরিতে উপযুক্ত ছিল। কিন্তু নবাব এ পর্যায়ে এসে অতি সাধারণে পরিণত হয়েছেন। কারাগারের অনুতাপ তাঁর এই কারুণ্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে–

> ঈশ্বর দেখছেন, পাপের পরিণাম আছে, তা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মনে উদয় হয় নাই। সত্যই অনুতাপে কি প্রায়শ্চিত্ত হয়? জগদীশ্বর, আমার কি মার্জ্জনা আছে? প্রভু! অন্ধ, চৈতন্যহীন, নবাবিগর্ব্বে গর্ব্বিত, বহু অপরাধে অপরাধী! কিন্তু তুমি দয়াময়,– প্যায়গম্বর বলেন– তুমি দয়াময়, প্যায়গম্বরের বাক্য রক্ষা করো, আমার অনুতাপ গ্রহণ করো![২৫]

যুদ্ধশেষে শর্ত মোতাবেক অর্থ প্রদান করতে গিয়ে মীরজাফর বিপদে পড়ে। শূন্য রাজকোষ নিয়ে সে যে বেশি দিন ইংরেজদের সন্তুষ্ট রাখতে পারবে না, নাটকে তার ইঙ্গিত আছে। উমিচাঁদের সাথে নিষ্ঠুর প্রতারণা করে ইংরেজরা তাদের প্রকৃত চরিত্র আর একবার উন্মুক্ত করে গেল।

হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করার আদর্শ নাটকটির সর্বত্রই বর্তমান ছিল। যেমন কলকাতা যুদ্ধযাত্রার আগে দরবারে নবাব অমাত্যবর্গের উদ্দেশ্যে বলেন–

> হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা ক'রবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাংলার নই। আপনাদের যদি বর্জ্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্ত্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য্য প্রদান ক'র্‌বো।... কোন বিদেশী রাজকার্য্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দু-মুসলমানগণ একস্বার্থে বাঙ্গলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না।... যদি আমার প্রতি বিদ্বেষ পরিত্যাগ না করেন, পূর্ণিয়ায় সকতজঙ্গের সঙ্গে যোগদান করুন কিম্বা বিদ্রোহীর ধ্বজা উড্ডীন করে যোগ্যজনকে সিংহাসন প্রদান করুন। কিন্তু স্থির জানবেন, ফিরিঙ্গি বাঙ্গলার দুশ্‌মন।[২৬]

এর পরে নাট্যকারের নাটক রচনার আদর্শ নিয়ে কোন দ্বিধা থাকে না। একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, 'অন্ধকূপ হত্যা'র বিষয়টিকেও তিনি অপপ্রচার হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন নাটকে। সিরাজদ্দৌলার দুর্বলতার অন্যতম জায়গা ছিল ধর্মবিশ্বাসে আস্থাবান হওয়া। কোরান স্পর্শ করেও কেউ মিথ্যাচার করতে পারে একথা তিনি বিশ্বাস করতে পারেননি (এর মধ্যদিয়ে নাট্যকার মূলত নবাবের ধর্মানুগত্যকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন)। পরিস্থিতি অনুধাবন করেও অন্ধ বিশ্বাস করেছিলেন বলেই তাঁর এরূপ করুণ পরিণতি ঘটেছিল। নাট্যকার সিরাজদ্দৌলাকে এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নৃপতি হিসেবেই চিত্রিত করেছেন। চিত্রিত করেছেন তুলনামূলকভাবে বিস্তারিত বর্ণনাসহযোগে।[২৭]

দুই

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *সিরাজদ্দৌলা* অন্যদের তুলনায় সার্থক হলেও ইতিহাস-জ্ঞান না থাকলে তাঁর নাটকের বিষয়-অনুধাবন ব্যাহত হতে বাধ্য। ঘটনার সংক্ষিপ্তকরণ, ইঙ্গিতধর্মিতা, ছোট ছোট বাক্যে নাটকের গতিময়তা, নাট্যিক ঘটনা সমাবেশ, মঞ্চসজ্জা– সব মিলিয়ে নাটকটি অভিনব হয়ে উঠেছে। তিন অঙ্কে এবং প্রতি অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য সমন্বিত নাটকটি শুরু এবং শেষ হয়েছে নবাবের দরবারে। ঘটনা উপস্থাপনে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত তিনি সরলরৈখিক ছিলেন না। কখন ছোট একটি বাক্যে, কখন-বা ঐতিহাসিক ঘটনাসংক্রান্ত দু'একটি শব্দ কিংবা কেবল ইঙ্গিতময়তার মাধ্যমে কাহিনির ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখেছেন। "ইতিহাসকে বিকৃত রেখেই হোক, কিংবা, খণ্ডিত করেই হোক, 'ঐতিহাসিক রসের' অবতারণা করতে পারলেই ঐতিহাসিক-সাহিত্যের সার্থকতা।"[২৮] শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মনোযোগ ঐতিহাসিক-সাহিত্য-রসের দিকেই ছিল। ইতিহাসের হুবহু ধারাক্রম তাঁর লক্ষ্য ছিল না। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, 'সিরাজের অসহায়তা, সিরাজের পারদর্শিতা, সিরাজের অন্তরের দয়া দাক্ষিণ্যই তাঁকে জীবনের শোচনীয় পরিণতির পথে ঠেলে দিয়েছিল– তাঁর অক্ষমতাও নয়, অযোগ্যতাও নয়।'[২৯] তাঁর সিরাজদ্দৌলা রাজ্যের অমাত্যবর্গের অসহযোগের বিষয়ে সচেতন ও দৃঢ়, অথচ সরল ও হৃদয়বান। নাট্যসংলাপে নবাবের স্বীকারোক্তি–

> আমি জানি কেমন করে ওদের কণ্ঠ রোধ করা যায়, কেমন করে স্পর্দ্ধায় উন্নত ওদের শির আমার পায়ের তলায় নুইয়ে দেওয়া যায়। শুধু আমার মুখের একটি কথা, চোখের একটি ইঙ্গিত সাপেক্ষ। আমি তা'ও পারি না। পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে, পারি না শুধু পরের ব্যথায় আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে।[৩০]

বুঝতে পেরেও প্রতিবিধান করতে না-পারা তাঁর পরাজয়ের কারণ। তবে নবাব ছিলেন অসহায়, অনন্যোপায়।[৩১] গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত তিনিও দেখাতে চেয়েছেন যে, সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের মূল কারণ অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্র। তবে তাঁর নাটকে ষড়যন্ত্রকারীরা ভীত নয়, সাহসী ও প্রতিস্পর্ধাপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে তাদের ভীত হওয়ার কোন কারণও থাকার কথা নয়। এই নাটকে রাজবল্লভ বুদ্ধিমান তথা ধূর্ত। মীরজাফর , ঘসেটি বেগম, উমিচাঁদ প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে সমুপস্থিত। নাট্যকার দেখাচ্ছেন যে, নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে বিরোধিতা করতেও তাদের বুক কাঁপে না। জগৎশেঠের সাথে নবারের কথোপকথন থেকে দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে–

> জগৎশেঠ। আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করে আমাদের লাভ?
> সিরাজ। স্বার্থসিদ্ধি।
> জগৎশেঠ। স্বার্থের সন্ধানে আমরা যদি নিযুক্ত থাকতাম–
> সিরাজ। বলুন, তা হ'লে?
> জগৎশেঠ। তা হ'লে বাংলার সিংহাসনে এতদিন অন্য নবাব বসতেন।
> সিরাজ। এত বড় কথা আমার মুখের ওপর বলতে আপনার সাহস হয়!
> জগৎশেঠ। আপনার উপদ্রবই আমাদের মনে এই সাহস এনে দিয়েছে।
> সিরাজ। আমার উপদ্রব নয় শেঠজী, আমার সহিষ্ণুতাই আপনাদের স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে![৩২]

ইংরেজদের ভূমিকাকেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল, ইংরেজরা বিক্রমের সাথে নয়, বরং কূট কৌশলে রাজন্যবর্গের সাথে ষড়যন্ত্র করে সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছে। ইংরেজদের সামর্থ্যের বদলে হীন কৌশলের ব্যবহারকে বড় করে দেখানোর মধ্যে সমকালীন জাতীয়তাবাদের প্রভাবও কম নয়। দেশীয় রাজন্যবর্গকে চক্রান্তে একাত্ম করতে মন্ত্রণাকক্ষে ওয়াট্‌সের বক্তব্য–

> আপনারা বিচার করিয়া দেখুন। আপনাদের কি অভাব আছে? বিচার করিয়া দেখুন। আপনাদের ফৌজ চাই, মিঃ জাফর আলি খাঁ যোগাইবেন; আপনাদের টাকা চাই, শেঠ জগতের টাকশাল আছে; আপনাদের সল্লা দিবার লোক চাই, রাজবল্লভ আছেন। ব্যস্! আর কি চাই? মুর্শিদাবাদ আপনাদের হইবে, বাংলা বিহার ওড়িসা আপনাদের হইবে– আর আমরা– আমরা আপনাদের প্রজা হইয়া মজাসে বাণিজ্য করিবে।[৩৩]

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে কোন চরিত্রই অবহেলিত নয়। ঘসেটি বেগম এখানে বুদ্ধিদীপ্ত ও সিরাজদ্দৌলার পতন আকাঙ্ক্ষায় সদা তৎপর। লুৎফুন্নেসা পূর্বোক্ত নাটকের মত স্বামী-অন্তপ্রাণ নয়, কোমলমতী ও পতিপরায়ণ হয়েও বুদ্ধিমতী ও চতুর। নাট্যকার ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দি করতে লুৎফুন্নেসাকে অন্তর্ভুক্ত করেন, যদিও তা ইতিহাসসম্মত নয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মত তিনিও দুটি কাল্পনিক চরিত্র নির্মাণ করেন– আলেয়া ও গোলাম হোসেন। আলেয়ার পরিচয়ে জানা যায় সে মোহনলালের বোন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতানুসারে মোহনলাল তার অপরূপ সুন্দরী এক বোনকে সিরাজদ্দৌলার কাছে সমর্পণ করেছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] আর গোলাম হোসেন নাট্যকারের জাতীয়তাবাদী আদর্শায়িত নাট্যচরিত্র–

> উৎকট তাহার চেহারা, তেমনই উদ্ভট পোষাক। এক পায়ে প্যান্ট আর বুট আর এক পায়ে মোগলাই পাজামা আর নাগরা। দেহের এক অর্দ্ধে ইংলিশ কোট আর এক অর্দ্ধে নামাবলির মেরজাই। গলায় কণ্ঠী, নাকে তিলক, মাথায় অর্দ্ধেক টপ-হ্যাট আর অর্দ্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপ দাড়ি। প্রকাণ্ড একগোছা টিকি।[৩৫]

ব্রিটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদকে দমন করতে ইংরেজরা হিন্দু-মুসলিম কৃত্রিম বিরোধকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এই বিভেদের বিপরীতে তাঁর নাটকে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের কথা প্রচার করলেন। পলাশির যুদ্ধের প্রাক্কালে সিরাজদ্দৌলার সংলাপে শোনা যায়–

> বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়– মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুল্‌বাগ এই বাংলা।... বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্য্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্পনা, জাতির সৌভাগ্য-সূর্য্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমান জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান?[৩৬]

ভারত ভাগের পূর্বে এই আহ্বান প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শচীন্দ্রনাথের সিরাজদ্দৌলা বাঙালির জাতীয় বীর হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল। লক্ষণীয় বিষয় হল, সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিন গুরুতর অভিযোগের মধ্যে 'অন্ধকূপ হত্যা'র মিথ্যাচারকে তিনি সজ্ঞানে বর্জন করেছেন। ইন্দ্রিয়বিকারের ঘটনাগুলোকে মিথ্যা অপবাদ হিসেবে অতি সংক্ষেপে, কখন-বা নামোল্লেখ মাত্র করে, উপস্থাপন করেছেন। অন্যদিকে তাঁর নবাবসুলভ জ্ঞান ও পরিপক্বতার ব্যাপারে নবাবকে ভাগ্যবিড়ম্বিত অসহায় হিসেবে দেখিয়েছেন। তবে এই নাটকে দেখা যায়, পলাশির ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে নবাব স্পষ্ট ধারণা পান, যুদ্ধের ময়দানে। মীরজাফরের চাতুরীতে বিষয়টি যেন তিনি আঁচ করতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদ্দৌলা অনুমান করতে পেরেও অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই মীরজাফরের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। আবার এই নাটকের সমাপ্তি হয়েছে নবাবের দরবারে। সেখানে মোহাম্মদী বেগ নবাবের বুকে ছুরি দিয়ে খুন করার পর নবাব একটি হাত সিংহাসনে রেখে মারা যান।

ইতিহাসের হুবহু অনুকরণ তিনি করেননি। জাতীয় বীর হিসেবে রূপায়িত করা সত্ত্বেও নবাবের ইন্দ্রিয়লালসার অপবাদকে পরোক্ষভাবে তিনি স্বীকার করেছেন। নবাবের দৃঢ়তা আলেয়া কিংবা লুৎফুন্নেসা প্রসঙ্গে এসে যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে জাতীয় আবেগ সৃষ্টিতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের *সিরাজদ্দৌলা* অনন্য ছিল।

তিন

হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের যে আদর্শ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁদের নাটকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা সাম্প্রদায়িক বিভেদকে রোধ করতে পারেনি। ধর্মের ভিত্তিতেই ভাগ হয়ে গেল ভারতীয় উপমহাদেশ। সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯–১৯৭৫) চলে আসলেন ঢাকায়। ১৯৫১ সালে তাঁর নিজ বাড়িতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক অভিনীত হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু জাতীয় চেতনা নতুন ধারায় প্রবাহিত হওয়ায় এই নাটক নিয়ে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। সে কারণে নিজেই নতুন করে *সিরাজ-উ-দ্দৌলা* (১৯৬৫) নাটকটি লিখে ফেললেন। 'নাট্যকারের কথা'য় লেখক এই নাটক সম্পর্কে আগেই জানিয়ে রাখলেন–

> জাতীয় চেতনা নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। কাজেই নূতন মূল্যবোধের তাগিদে ইতিহাসের বিভ্রান্তি এড়িয়ে ঐতিহ্য এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে সিরাজ-উ-দ্দৌলাকে আমি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে আবিষ্কারের চেষ্টা

> করেছি। একান্তভাবে প্রকৃত ইতিহাসের কাছাকাছি থেকে এবং প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসকে অনুসরণ করে আমি সিরাজ-উ-দ্দৌলার জীবননাট্য পুনর্নির্মাণ করেছি। ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস, তাঁর চরিত্রের যে দৃঢ়তা এবং মানবীয় সদগুণগুলিকে চাপা দেবার জন্যে ঔপনিবেশিক চক্রান্তকারী ও তাদের স্বার্থান্ধ স্তাবকেরা অসত্যের পাহাড় জমিয়ে তুলেছিল, এই নাটকে প্রধানতঃ সেই আদর্শ এবং মানবীয় গুণগুলিকেই আমি তুলে ধরতে চেয়েছি।[৩৭]

দেশভাগের পূর্বে জাতীয়তাবাদ ধর্মদ্বারা গ্রস্ত হয়েছিল। দেশভাগের পর ধর্মকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদের দিকে পূর্ববাংলার বহু মানুষের ইতিবাচক মনোভাব ছিল। কিন্তু ভুল ভাঙতে সময় লাগেনি সংস্কৃতিবান মানুষের। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জাতীয়তাবাদ আবার উদার মানবতাবাদের দিকে ধাবিত হয়। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পর এই ধারা প্রবল হয়। ষাটের দশকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রেরণাও এটি। এই সময়ে ইতিহাস থেকে প্রেরণা নিতে 'নূতন মূল্যবোধ' তৈরির তাগিদে সিকান্দার আবু জাফর সিরাজদ্দৌলাকে নতুন করে নির্মাণ করলেন। তিনি সিরাজদ্দৌলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন প্রকৃত বীর, দৃঢ়চেতা ও আদর্শ শাসক হিসেবে। নাটকের শুরুতেই সিরাজদ্দৌলাকে সাহসী, বিজয়ী, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন করে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। তবে ধর্মীয় মূল্যবোধের দিকে তিনি কিছুটা বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। 'ধর্ম এবং নৈতিক আদর্শে সিরাজ-উ-দ্দৌলার যে অকৃত্রিম বিশ্বাস', তার প্রমাণস্বরূপ সিকান্দার আবু জাফরের নাটকে প্রথম বিজয়ের পরই সিরাজদ্দৌলার সংলাপে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভেতরে একটি মসজিদ তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়। 'তিনি সিরাজদ্দৌলার নারী-আসক্তি সম্পর্কিত সকল প্রসঙ্গ সযত্নে পরিহার করেছেন।'[৩৮] এ-বিষয়ে তিনি কোন কথাই বলেননি। যদিও ঐতিহাসিকভাবে প্রথম বয়সের বিলাসবাসনা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। এড়িয়ে গেছেন 'অন্ধকূপ হত্যা'র মিথ্যা অপবাদের প্রসঙ্গও। উল্লেখ্য যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ হিসেবেও তিনি সিরাজদ্দৌলাকে নির্মাণ করতে চাননি। সে-কারণে তাঁর নাটকে এ-সংক্রান্ত কোন বক্তব্য নেই। এখানে একজন আদর্শ তেজস্বী বীর হিসেবে সিরাজদ্দৌলাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নাটকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ জয়ের পর নবাবের আদেশ–

> গভর্ণর ড্রেকের বাড়িটা কামানের গোলায় উড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিন। গোটা ফিরিঙ্গি পাড়ায় আগুন ধরিয়ে ঘোষণা করে দিন সমস্ত ইংরেজ যেন অবিলম্বে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আশেপাশের গ্রামবাসীদের জানিয়ে দিন তারা যেন কোনো ইংরেজের কাছে কোনো প্রকারের সওদা না বেচে। এই নিষেধ অগ্রাহ্য করলে তাকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।[৩৯]

নাটকে সিরাজদ্দৌলার দৃঢ়তা নজরে আসার মত। সযত্নে তিনি সিরাজদ্দৌলার চরিত্রটিকে নিষ্কলুষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তবে তা ইতিহাসকে বিপরীত অর্থে দাঁড় করিয়ে নয়। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ইতিহাসকে পুরোপুরি অমান্য করা চলে না। সিকান্দার আবু জাফর সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসকে ইতিবাচক করে উপস্থাপন করতে নবাবের নেতিবাচকতাকে পরিহার করেছেন। তবে নেতিবাচকতাকে পুরোপুরি এড়ানো তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। চক্রান্তকারীদের নানা অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত থেকেও ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলা তাদের শাস্তি দিতে পারেননি। এই নাটকে নবাব মীরজাফরকে বন্দির আদেশ দিয়েও তা ফিরিয়ে নিয়ে বলেন–

> না, আমি তা করব না। ধৈর্য ধরে থাকব। অসংখ্য ভুল বোঝাবুঝি, অসংখ্য ছলনা এবং শাঠ্যের ওপর আমাদের মৌলিক সম্প্রীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ সন্দেহেরও কোনো অবকাশ রাখব না।[৪০]

সন্দেহ দূর করতে রাজন্যবর্গকে দিয়ে কোরান ও তামা-গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়ে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। এ ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা রয়েছে। মূলত নাট্যকার এখানে সিরাজদ্দৌলাকে ধর্মপ্রাণ হৃদয়বান নবাব হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। তবে ষড়যন্ত্রকারীরা এখানে পূর্বোক্ত নাটকের চেয়েও দৃঢ়। নবাবের বিরুদ্ধে তাদের কর্মপরিকল্পনা, সংকল্প ও উপলব্ধি তাদের জবানিতেই উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। মন্ত্রণা সভায় জগৎশেঠের প্রশ্নের উত্তরে মীরজাফর বলছে–

> না শেঠজী, হতাশ হবার প্রশ্ন নয়। আমি নিস্তব্ধ হয়েছি। অগ্নিগিরির মত প্রচণ্ড গর্জনে ফেটে পড়বার জন্যে তৈরি হচ্ছি। বুকের ভেতর আকাঙ্ক্ষার আর অধিকারের লাভা টগবগ করে ফুটে উঠছে ঘৃণা আর বিদ্বেষের অসহ্য উত্তাপে। এবার আমি আঘাত হানবোই।[৪১]

ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থদ্বন্দ্ব শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যেমন দেখিয়েছেন, সিকান্দার আবু জাফরও তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ নাটকেও অবশ্য মূল কলকাঠি তাদের হাতেই। ইংরেজদের নবাবের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে তারাই। চক্রান্তে লিপ্ত প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ এই নাটকে তাদের স্বার্থবাদী ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত। 'এরা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার ব্যক্তিত্ব এবং বীরত্বকে স্বীকার করে।'[৪২] অন্যদিকে ইংরেজ প্রতিনিধিরা তাদের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা ব্যর্থতা নিয়ে সমুপস্থিত। ইংরেজদের চেয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা বোঝা যায় নিম্নোক্ত সংলাপে–

> জগৎশেঠ : ভগবানের দিব্যি কর্নেল সাহেব, তোমরা বড় বেহায়া। এই সেদিন কলকাতায় যা মার খেয়েছো এখনো তার ব্যাথা ভোলার কথা নয়। এরি ভেতরে–
>
> ক্লাইভ : দেখো শেঠজী এক আধবার অমন হয়েই থাকে। তা'ছাড়া রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে এখনো যুদ্ধ হয় নি। যখন হবে তখন তোমরাই তার ফলাফল দেখবে।
>
> রাজবল্লভ : সেটা দেখাবার আগেই গলাবাজি করছ কেন?[৪৩]

এই নাটকের একটি বড় দিক হল ইংরেজ চরিত্রগুলোকে বঙ্গীয় দৃষ্টিকোণে উপস্থাপন করা। হলওয়েলকে 'হাতুড়ে সার্জন' ও 'ঘুষখোর ডাক্তার', ওয়াটস্‌কে 'চরিত্রহীন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নাট্যকার। ক্লাইভ কখনো মেয়ে সাজে, কখন-বা সই জাল করে। সে প্রচণ্ড সাহসী, একরোখা ও নির্মম। এসব সত্ত্বেও ইংরেজরা এ নাটকে আগের নাটকের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়, সুখ-দুঃখে, হাসি-কান্নায় নিজস্ব উপলব্ধি নিয়ে জীবন্ত। তারা সবাই এখানে ভাগ্যান্বেষী। ইংরেজদের দেয়া ভালো-মন্দের বানোয়াট মানদণ্ডে নয়, তাদের দেশীয় দৃষ্টিতে দেখেছেন নাট্যকার, যা নাটকটিকে অনন্যতা দান করেছে। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক–

> রাইস : অনেকগুলো সাহেব মেমসাহেব হুজুর। ভূত ভূত চেহারা সব।
>
> মীরজাফর : কারো নাম জানো না?
>
> রাইস : সব তো বিদেশী নাম। এদেশী হলে পুরুষগুলোকে বলা যেত বেম্মোদত্যি, জটাধারী, মামদো, পেঁচো, চোয়ালে পেঁচো, গলায় দড়ে, এক ঠেংগে, কন্দকাটা ইত্যাদি। মেয়েগুলোকে বলতে পারতাম: শাঁকচুন্নী, উলকামুখী, আঁষটেপেতী, কানি পিশাচী এইসব আর কি।[৪৪]

সবকিছুর মধ্যে নাট্যকারের মূল লক্ষ্য ছিল সিরাজদ্দৌলাকে যতটা নিষ্কলঙ্ক হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, তার দিকে। সিরাজদ্দৌলাকে প্রজাবৎসল দেখাতে তিনি একজন পীড়িত লবণবিক্রেতাকে হাজির করেন দরবারে। আবার সিরাজদ্দৌলা দৃঢ়ভাবে রাজকার্য সম্পন্ন করলেও তাঁর হৃদয় সাধারণ মানুষের মত জাগতিক সুখ-দুঃখের উত্তাপ পেতে চায়। লুৎফুন্নেসাকে তিনি বলেন–

> অনেক সময় সত্যিই তা ভেবেছি লুৎফা। তোমার খুব কাছাকাছি বহুদিন আসতে পারিনি। আমাদের মাঝখানে একটি রাজত্বের দেয়াল। মাঝে মাঝে ভেবেছি, এই বাধা যদি দূর হয়ে যেত। নিশ্চিন্ত সাধারণ গৃহস্থের ছোট্ট সাজানো সংসার আমরা পেতাম।[৪৫]

পূর্বের দুই নাটকে লুৎফুন্নেসা ছিল গৌণ। কাল্পনিক নারী চরিত্রই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। সিকান্দার আবু জাফর তাঁর নাটকে কোন অনৈতিহাসিক চরিত্রকে প্রাধান্য দেননি। এই নাটকে 'বেগম লুৎফা একদিকে পতিপরায়ণা, অপরদিকে দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালিনী অসীম মনোবলের অধিকারিণী নারী হিসেবে চিত্রিত।'[৪৬] তাঁর মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল অবশ্যই সিরাজদ্দৌলা। রাজ্যশাসনে, প্রজাপালনে ও বিরোধীদের মোকাবেলা করতে তাঁর নবাব বিচক্ষণ ও সাহসী। পলাশির যুদ্ধের প্রাক্কালেও তিনি সবকিছু বিচার করে দেখেন। অনন্যোপায় হয়েই মীরজাফরের উপর সেনাপতির ভার দিতে হয়। ফলে ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে তাঁর। এই পরাজয়ে নাট্যকার ইংরেজ সামর্থ্যকে ছোট করে দেখাননি। যুদ্ধের বর্ণনা তাঁকে আকৃষ্ট করেনি।[৪৭] তবে এখানেও শেষ প্রশ্নে ষড়যন্ত্রই পরাজয়ের মূল কারণ। সিরাজদ্দৌলা এই নাটকে সকল ধরনের বিকারহীন, প্রজাপালক, সাহসী যোদ্ধা, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনে গভীর আস্থাশীল, সহৃদয়বান এক মহান দেশপ্রেমিক। আর তা দেখানোর জন্য সিকান্দার আবু জাফর পলাশির প্রান্তরে মীরজাফরের পায়ে মুকুট সমর্পণের দৃশ্যকে বাদ দিয়েছেন। সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের কোন ধরনের ত্রুটি তিনি বরদাস্ত করেননি। ফলে চরিত্রায়ণ একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হয়েছে।[৪৮] তাঁর সিরাজদ্দৌলা দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করাকেই দায়িত্ব মনে করেছেন। তিনি দেখান যে, পলাশিতে পরাজিত হয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরলে সাধারণ মানুষ নবাবের জন্য সমবেদনা বোধ করে এবং বিজয়ী সৈন্যের অত্যাচারের ভয়ে পালিয়ে যায়। সিরাজদ্দৌলা দরবারে এসে আবার যুদ্ধ করার জন্য সাধারণ মানুষকে একত্র করতে চেষ্টা করেন। মোটের উপর, দেশপ্রেম তথা স্বাধীনতা রক্ষার আদর্শ সৈনিকরূপে ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌলাকে উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি 'সিকান্দার আবু জাফর ষাটের দশকে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের সেই দিনগুলিতে এই নাটকের মাধ্যমে আন্দোলনরত নিপীড়িত বাঙালিদের মধ্যে সিরাজদ্দৌলার সংগ্রামী চেতনার অভিঘাত বোঝাতে চেয়েছেন।'[৪৯]

চার

সাঈদ আহমদ পূর্বোক্ত নাট্যকারদের চিত্রিত সিরাজদ্দৌলাকে 'নবরূপে উপস্থাপন' করেছেন *শেষ নবাব* (১৯৮৯) নাটকে। এ কাজে তাঁর লেগে গেছে বারোটি বছর।[৫০] নবরূপের সিরাজদ্দৌলা নাট্যকারের সমকালীন বাস্তবতায় জারিত হয়ে এসেছেন।

> সিরাজদ্দৌলার শক্তি আর সাহস আর দেশপ্রেমকে নাট্যকার সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন সমকালীন জনমানুষের চিত্তে, ফলে সিরাজদ্দৌলা তাঁর হাতে উপস্থাপিত হয়েছে নতুন পরিচয়ে, নতুন সত্তায়। ইতিহাসের জটিলতা কাটিয়ে সিরাজদ্দৌলাকে তিনি সমুত্থিত বাঙালির রূপক চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন, ইতিহাসের অস্থি-করোটিতে তাই সহসাই প্রতিভাসিত হয় আরেক শ্রেষ্ঠ বাঙালির অবয়ব, শেখ মুজিবুর রহমান যাঁর নাম।[৫১]

নাটকে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের রূপক হয়ে এসেছে। আবেগের বাহুল্য বর্জন করে নাট্যকার সমস্ত ঘটনাকে রাজনীতির নির্মোহ বিশ্লেষণে ধরার চেষ্টা

করেছেন। ঘসেটি বেগম ছাড়া অন্য কোন নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না এই নাটকে। সে এই নাটকে হীনবল অশ্রুকাতর আবেগী কোন নারী চরিত্র নয়। পুরোদস্তুর রাজনীতিজ্ঞ এবং সিংহাসনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। নাটকের শুরুতেই মাঝবয়সী, সুন্দরী, রুচিসম্পন্ন ঘসেটি বেগম সম্পর্কে রাজবল্লভ বলছে–

> ঘসেটি বেগম সম্পর্কে আর কি বলবো? একাই একশো। স্বামীকে কর আদায়ের তরিকা বোঝাতেন, সেনাপতিকে কামানের গোলা তৈরীর মশলা বাতলাতেন। আর অন্দর মহলে ভৈরবীর নতুন নতুন বন্দিশ শোনাতেন। মাঝে মাঝে ভাবি যে যদি ভগবান বেগম সাহেবাকে পুরুষ বানাতেন তা হলে আমাদের ঘোল না খাইয়ে ছাড়তেন না।[৫২]

তার স্বামী নওয়াজিশ আলীর অমাত্য ছিল রাজবল্লভ। নাট্যকার রাজবল্লভের ঢাকার জনজীবনকে শোষণে ও দুর্ভোগে অতিষ্ঠ করার কথা উপস্থাপন করেছেন। ১৭৫৭ সালের পলাশির প্রান্তর আর ১৯৭৫ সালের পরবর্তী ঢাকা তথা বাংলাদেশ নাট্যকারের কাছে সমান্তরাল হিসেবে গৃহীত হয়েছে। নাটকের শেষে নবাবের সংলাপে বিষয়টি আরও স্পষ্ট আকারে ধরা পড়েছে।[৫৩]

অন্যদের তুলনায় এই নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বড় পার্থক্য হল, চরিত্রসমূহের সংলাপে আবেগের স্থান না-দেয়া। তিনি সকল বিষয়কে রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেয়েছেন। পূর্বোক্ত নাটকগুলোতে ষড়যন্ত্রকারীদের কোন-না-কোনভাবে হেয় করে দেখানো হয়েছে। কখন ভীরু, কখন দ্বিধান্বিত, কখন-বা নীতিহীন মনে হয়েছে। কিন্তু এই নাটকে কোন চরিত্রই নিজের বোধের কাছে অপরাধী নয়, তুচ্ছ নয়। নিজের কাজের জন্য কোন চরিত্রের মধ্যেই অপরাধবোধ নেই। বরং নিজের কাজের পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখাচ্ছে সকলে। নবাবের বিরুদ্ধে গুজব ও মিথ্যা দোষারোপ চাপায়নি কোন পক্ষই। ষড়যন্ত্রী, ইংরেজ ও নবাব– এই ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব এই নাটকে একান্তভাবেই রাজনৈতিক। ঘসেটি বেগম-মীরজাফরেরা যে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাদের মতে, তার পেছনে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ নয়, প্রধান কারণ স্বদেশচিন্তা। সাথে যুক্ত হয়েছে অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার বাসনা।[৫৪] তারা ভালো করেই ইংরেজদের মতলব অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু 'নবাব প্রজাদের শোষণ করতে চাইছেন ফুর্তির জন্য', তাই তাঁর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যই যেন তারা ইংরেজদের সাথে চক্রান্তে লিপ্ত হচ্ছে। ঘসেটি বেগম তাই বলছে, 'আমাদের একতার খাতিরে, আমাদের দেশের খাতিরে সবাই একজোট হয়ে কাজ করব। বাংলার শত্রুরা নিপাত যাক। এই সংঘাত ঈমানদার আর মোনাফেকদের'। মীরজাফর ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে মসনদে তার দাবির পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়।[৫৫] ইংরেজরাও নিজেদের অবস্থান বিষয়ে সজাগ। তাদের দৃষ্টিতে 'সিরাজ একজন স্বেচ্ছাচারী নবাব', তাই সংঘটিতব্য সংঘাতকে তথা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করাকে, তারা কর্তব্য মনে করেছে। এখানে দেখানো হয়েছে যে, দেশীয় অমাত্যবর্গ নয় ইংরেজরাই পরবর্তী নবাব কে হবে তা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। ক্লাইভের সংলাপে বলা হয়েছে, 'বাংলার মসনদে বসার জন্য আমাদের মতে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি হলেন জনাব মীরজাফর খান। তাঁকেই আমরা choose করেছি।' উল্লেখ্য যে, মীরজাফর ও ক্লাইভ চরিত্র চিত্রণে নাট্যকার পূর্বোক্ত নাট্যকারদের চেয়ে অনেক বেশি নির্মোহ ছিলেন। নিতান্ত গরিব ঘরের ছেলে হয়েও কিভাবে কর্নেল ক্লাইভে পরিণত হয়েছে, তা উপস্থাপন করেছেন। সিরাজদ্দৌলাও এজন্য তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।[৫৬] অন্যদিকে ইতিহাসে চির কলঙ্কিত মীরজাফরের জবানিতে 'আমিও মানুষ' কথাটি

সংযুক্ত করেছেন। কিন্তু এদেশীয় মানুষের প্রতি ক্লাইভের ধারণা ছিল স্পষ্ট। সে সহজ করেই জানিয়ে দেয়–

> এ দেশে প্রতিবাদ কেবল তখনই শোনা যায় যখন নিজের স্বার্থে আঘাত লাগে। নিজে safe থাকলে অন্যের কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো এদের স্বভাবে নেই। এ দেশের কী হবে, এ জাতের কী হবে তা নিয়ে কারু কোন চিন্তা নেই। দল পাকাতে এরা ওস্তাদ। চক্রান্ত করতে এরা সিদ্ধহস্ত।[৫৭]

একান্তভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটনাকে বর্ণনা করার জন্য নাট্যকার 'নবাবের অন্দরমহলের জীবনাচার রূপায়ণে আগ্রহী ছিলেন না; একারণে নবাবের স্ত্রী লুৎফুন্নেসা পর্যন্ত এ নাটকে অন্তর্ভুক্ত হননি।'[৫৮] অন্য নাট্যকারেরা সিরাজদ্দৌলার অপমান, দুঃখ, কষ্টকে পাঠক/দর্শকের কাছে উপস্থাপন করে এক ধরনের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করেছেন, যা সাঈদ আহমদের এই নাটকে পরিলক্ষিত হয় না।

সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিন গুরুতর অভিযোগের তিনটিই পরিহার করেছেন নাট্যকার, যেমনটি করেছেন সিকান্দার আবু জাফরও। তবে সেখানে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র একদেশদর্শী দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই নাটকে নাট্যকার সাঈদ আহমদ অতি সাবধানে একজন একনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে সিরাজদ্দৌলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অন্য চরিত্রগুলোকেও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রচিন্তাবহির্ভূত কোন অভিযোগ করতে দেখা যায় না। বরং সিরাজদ্দৌলাই মীরজাফরকে জানায়, 'রানী ভবানীর দুহিতার সঙ্গে বা নাচনেওয়ালী ফৈজীর ব্যাপারে যে সব খবর শুনেছেন সেগুলো ডাহা মিথ্যা'। এ ব্যাপারে মীরজাফরের বিশেষ কোন আগ্রহ লক্ষ করা যায় না।

এ-নাটকে সিরাজদ্দৌলা ইংরেজদের ভাল করেই বুঝতে পারেন, বুঝতে পারেন তাদের অভিসন্ধি। মীরজাফর-ঘসেটি বেগমের চক্রান্তও বুঝতে পারেন। নবাব তাই রাজনীতির কৌশলেই তাদের সকলকে পরাভূত করতে চেয়েছেন। নাটকে তাই নবাবকে বলতে শোনা যায়–

> বামে কর্নেল ক্লাইভ, মাঝখানে সিরাজদ্দৌলা এবং ডাইনে ঘসেটি বেগম। সবার লক্ষ্য ওপরে–বাংলার তখত্। সবাই বসতে চান ওই কুরশিতে। ক্লাইভ এই দেশের সবচেয়ে দুর্বল স্নায়ুর সন্ধান পেয়ে গেছেন। টাকার লোভ সামলাতে পারে এমন লোক আমার রাজ্যে বোধ হয় আর বেশী নেই। আমি ইংরেজদের চিনি।... আমার রাজ্যে একতার দুর্ভিক্ষ। প্রত্যেকেই নিজেকে এক একজন ক্ষুদে নবাব মনে করেন এবং বড় নবাব হবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন।[৫৯]

সিরাজদ্দৌলা তাই তাদের আলাদা করে রাখতে চান। সে-কারণেই ঘসেটি বেগমকে গৃহবন্দি করেন এবং মীরজাফরের চক্রান্তের কথা জেনেও হাতছাড়া করতে চান না। কেননা ইংরেজরা একা হয়ে পড়লেই দুর্বল হয়ে পড়বে। লক্ষ করার বিষয়, এ-নাটকে সিরাজদ্দৌলা কোন সিদ্ধান্তই উত্তেজনার বশে নেন না। সবকিছু বিচক্ষণতার সাথে বিচার করে তবেই কাজে অবতীর্ণ হন। পলাশির যুদ্ধের কয়েকদিন আগে ক্লাইভকে লেখা মীরজাফরের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠি হস্তগত হওয়ার পরও সিরাজদ্দৌলা তাকে ক্ষমা করে দেন। মোহনলাল নবাবের এমন কাজ ঠিক হয়নি বলে মনে করলে নবাব তাকে বলেন–

> আমি জানি মীরজাফর, শেঠজী, ঘসেটি বেগম এবং আরো অনেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইংরেজের অলিন্দে অনেকেরই আনাগোনা। গোপনে সবাই ওদের কৃপাপ্রার্থী। সবার উদ্দেশ্য এক। সিরাজকে উচ্ছেদ করা। আমার

> শত্রুর সংখ্যা যত কম হবে ততই আমাদের মিত্রদের সংখ্যা বাড়বে। তাই মীর সাহেবকে আমি হাত ছাড়া করতে রাজি নই।[৬০]

এমনকি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেও সেনাপ্রধাদের মতকে গুরুত্ব দেন। মীরজাফরের সুনিপুণ চক্রান্তে সে মন্ত্রণায় বাদ পড়ে দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহনলাল, সাঁফ্রেরা। ফলে পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। সিরাজদ্দৌলার এই পরাজয়ের একমাত্র কারণ মীরজাফরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, 'দাদুর কসম, তখ্‌তের কসম, আর এই স্বাধীন দেশের ইজ্জতের কসম খাবার পর' কিংবা 'খোদার কসম' ও 'কোরানের কসম' খাবার পর সিপাহসালার কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না– এমন অন্ধ বিশ্বাসের কারণে পরাজয় যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, সেই সময়েই নাটকের সমাপ্তি ঘটে। নাট্যকার নবাবের পরাজয় দেখাতে চান নি। পরাজয় নিশ্চিতের মুহূর্তেই নাটকের যবনিকা টানেন। তার আগে নবাবের মুখে দীর্ঘ সংলাপ যোজনা করেন। সেখানে সাঁফ্রের অভিযোগের জবাবে নবাব বলেন–

> সাঁফ্রে তুমি বলে গেলে যে মীর সাহেবকে বিশ্বাস করে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি। খোদার কসম যদি আর জনমে আবার পলাশীতে আসার সুযোগ হয় তাহলে আবার আমি মীরজাফরকে বিশ্বাস করবো। সাঁফ্রে জবাব দাও এদেশের শাসনকর্তা এদেশের সিপাহসালারকে বিশ্বাস করবে না কি আর কাউকে করবে? এদেশের লোক এদেশের লোককে বিশ্বাস করবে নাকি আর কাউকে করবে? বিদেশী আগন্তুককে করবে? ক্লাইভ, কিলপ্যাট্রিক, কুটকে করবে?[৬১]

এখানে সিরাজদ্দৌলার সংলাপে যেন বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সাঈদ আহমদ সিরাজদ্দৌলাকে এমনভাবে রাজনীতিজ্ঞ তথা প্রকৃত শাসক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন যে, তার বিরুদ্ধে নৈতিক স্খলন, জ্ঞানের অগভীরতা কিংবা উগ্র মেজাজের অভিযোগগুলোকে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। শান্ত সৌম্য প্রখর বুদ্ধিমান ও দেশপ্রেমের এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে *শেষ নবাব* নাটকের সিরাজদ্দৌলা।

উপসংহার

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থে পলাশির যুদ্ধ তথা সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসকে নতুন করে নির্মাণ করার পর বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীর হিসেবেই রূপায়ণ করা হয়েছে। আর এ-কাজটি একেকজন নাট্যকারের হাতে একেক রকম হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলার এরূপ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে সিরাজদ্দৌলাকে তাঁর নাটকে উপস্থাপন করেছেন, সে সিরাজদ্দৌলাকে অসহায় ও কাতর মনে হয়। নাটক-শেষে তিনি অতি সাধারণ চরিত্রে পরিণত হন। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটকে তুলনামূলকভাবে এই প্রবণতা কম। অধিকন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে কাল্পনিক জহরা নাট্যকাহিনির মূল চালিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আলেয়া সিরাজদ্দৌলাকে প্রভাবিত করলেও আচ্ছন্ন করেনি। এই দুই নাটকে নারী-প্রসঙ্গে নবাবের চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। সিকান্‌দার আবু জাফর নবাব চরিত্রকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে দেখাতে গিয়ে একমুখীনতায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। তাঁর সিরাজদ্দৌলা হয়ে উঠেছেন একনিষ্ঠ ধর্মভীরু। আবার লুৎফুন্নেসা প্রসঙ্গে সাংসারিক সুখে কাতর হয়ে উঠেছেন। তবে তাঁর নাটকে কোন অনৈতিহাসিক চরিত্রকে গুরুত্ব

দেয়া হয়নি। সাঈদ আহমদ তাঁর নাটকে কোন অনৈতিহাসিক চরিত্র তো আনেনইনি, ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর মধ্যেও আবেগভারাক্রান্ত সংলাপের যোজনা করেননি। তিনি সমস্ত ঘটনাকে উপস্থাপন করেছেন রাজনীতিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর নাটকের কোন চরিত্রই কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয় না। কাউকে ভয়ও পায় না। মনে হয়, তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। প্রথম নাটকে অপবাদসমূহকে অপবাদ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় নাটকে অপবাদকে স্পষ্ট না করে ইঙ্গিতধর্মী কিংবা কেবল তুচ্ছ তথ্য হিসেবে হাজির করা হয়েছে। তৃতীয় নাটকে অপবাদকে বাদ দেয়া হয়েছে। চতুর্থ নাটকে অপবাদ কেবল বাদই দেয়া হয়নি, সমস্ত কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। চারজনের লেখা নাটকে সিরাজদ্দৌলা চরিত্র তাঁদের নিজ নিজ আদর্শ ও প্রবণতা দ্বারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। নাটক চারটিতে সিরাজদ্দৌলাকে পরিশীলিত করার একটি ধারাক্রমও ধরা পড়ে। একই সাথে সমকালীনতায় জারিত হয়ে বাংলা নাটকে সিরাজদ্দৌলার আখ্যান বদলে যাওয়ার ধরনও নজরে পড়ে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের হাতে সিরাজদ্দৌলাকে মূল্যায়নের যে নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল, উপর্যুক্ত চার নাট্যকারের হাতে তাও ক্রমান্বয়ে পরিমার্জিত হয়েছে। দেখা যায়, এই পরিমার্জনের ধারায় ইংরেজদের নির্মিত সিরাজদ্দৌলা সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র হিসেবে রূপ লাভ করেছে। উপনিবেশবাদের তৈরীকৃত ইতিহাসের বয়ান থেকে অনেকটা দূরবর্তী হয়ে পড়েছে বাংলা নাটকের সিরাজদ্দৌলার আখ্যান।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সিরাজদ্দৌলার নামের বানান নিয়ে ভিন্নমত প্রচুর। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সিরাজদ্দৌলা' লিখেছেন, রজতকান্ত রায় লিখেছেন 'সিরাজউদ্দৌল্লাহ্', তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন 'সিরাজউদ্দৌলা'। এছাড়াও 'সিরাজ-উদ-দৌলা', সিরাজ-উদ্-দৌলা, 'সিরাজ-উদ-দৌল্লা' প্রভৃতি নানান রকম বানান ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সিকান্দান আবু জাফর তাঁর নাটকের নাম লিখেছেন *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*। ভিন্ন ভিন্ন বানানের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই যুক্তি আছে। এই প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয় তা নয়। এই প্রবন্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সাঈদ আহমদ, শামসুর রাহমান প্রমুখ লেখকদের অনুসরণে 'সিরাজদ্দৌলা' বানানটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে অবশ্যই লেখকদের ব্যবহৃত বানানকে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

২. দেবীপদ ভট্টাচার্য, 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সাহিত্য-সাধনা', *গিরিশ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডক্টর দেবীপদ ভট্টাটার্য সম্পাদিত, সাাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১২, পৃ. বাষট্টি

৩. শামসুর রাহমান সাঈদ আহমদের *শেষ নবাব* নাটকের 'পূর্বলেখ' অংশে এ-সংক্রান্ত প্রায় বারোটি নাটক লিখিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৪. শামসুর রাহমান সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে প্রায় বারোটি নাটক লিখিত হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তিনি তার লেখক এবং নাটকগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। এমনকি নির্দিষ্ট সংখ্যাও জানা যায় না। মূলত সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে যতগুলো নাটক লেখা হয়েছে, তার মধ্যে এই প্রবন্ধে গৃহীত নাটক চারটিই বহুল পরিচিত এবং চর্চিত। পশ্চিম বাংলায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক দুটি নানান সময়ে অ্যাকাডেমিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখনও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক দুটি পাঠ্য। বাংলাদেশে সিকান্দার আবু জাফরের নাটকটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। সাঈদ আহমদের নাটকটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে এই প্রবন্ধে গৃহীত চারজন নাট্যকারের নাটকে চারটি বিশেষ কালপর্বের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। সিরাজ-আখ্যানের তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে সে কারণেও নাটক চারটির নির্বাচন প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে।

৫. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *সিরাজদ্দৌলা*, শেখর ভৌমিক সম্পাদিত, কল্লোল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৪
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮
৮. 'নবাব যত কেন দোষী হউক না, এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের অপরাধ তাহার স্কন্ধে চাপান যায় না, কারণ সঙ্কীর্ণ স্থানে অনেক লোক রাখিলে যে বিপত্তি ঘটে, ইহা তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।' (শেখর ভৌমিক, 'ভূমিকা', *সিরাজদ্দৌলা*, কল্লোল, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৬)
৯. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর *সিরাজদ্দৌলা* গ্রন্থে 'অন্ধকূপ-হত্যা' ও 'অন্ধকূপ-হত্যা–রহস্যনির্ণয়' পরিচ্ছেদদ্বয়ে এ-সংক্রান্ত জটিলতার মীমাংসা করেছেন।
১০. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২১
১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
১৩. 'পলাশীর যুদ্ধের পিছনে ছিল মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষের ষড়যন্ত্র। সে চক্রান্তের সঙ্গে সুবাহ্ বাংলার জনজীবনের কোনো যোগ ছিল না। এর পিছনে কোনো গভীর নিহিত সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে ওঠেনি– এই ষড়যন্ত্রের পিছনেও নয়, তার পূর্ববর্তী দুটি ষড়যন্ত্রের পিছনেও নয়।'(রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ১২) তাই ধর্ম নিয়ে তাদের মধ্যে কোন ধরনের সংকট ছিল না। পারস্পরিক সহাবস্থানের কথা তাই অনুমেয়।
১৪. দেবীপদ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. একষট্টি
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. তেষট্টি
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. একষট্টি
১৭. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, *গিরিশ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডক্টর দেবীপদ ভট্টাটার্য সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১২, পৃ. ৫৫৬
১৮. 'অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য উঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী রহিয়াছে, আবার তাঁহাদের ইঙ্গিতেই নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের কটাক্ষমাত্রেই বাঙ্গালার তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। যে ভয়াবহ বিপ্লবে মুসল্‌মান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যাহার দিগ্‌দাহকারী অগ্নিকাণ্ডে হতভাগ্য সিরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়,... তাহারই মূলে জগৎশেঠদিগের অমোঘ শক্তি নিহিত ছিল। অর্থ ও প্রাণ দিয়া তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।'(নিখিলনাথ রায়, *মুর্শিদাবাদ-কাহিনী*, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮-৪৯)
১৯. 'সিরাজ অত্যন্ত অস্থিত-বুদ্ধি ও চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তিনি সকল সময়ে তাহা প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার কটুবাক্য প্রয়োগে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪)
২০. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৪
২১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২
২২. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
২৩. সিরাজদ্দৌলার নিজ হাতে নয়, তাঁর আদেশে হত্যা করা হয়েছিল হোসেনকুলি খাঁ-কে। (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০)
২৪. গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৬
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২২
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২
২৭. ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সফলতা নিয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে ইতিহাস কম গুরুত্ব পেয়েছে বলে সমালোচক বলেন, 'বৃটেন ভারতের শত্রু, সেই বৃটেনের হাতে সিরাজ পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত, কাজেই পরাধীন বাঙালী সিরাজের সঙ্গে সমবেদনার সূত্রে জড়িত। কিন্তু দাবীর পক্ষে এই কারণটাই কি যথেষ্ট? তখনকার দিনে এত বিচার করবার অবকাশ ছিল না– বাঁশ যে ঝাড়েরই হোক ইংরাজকে পিটোবার পক্ষে সমান প্রশস্ত এই ছিল দেশাত্মবোধের বিধান'। (প্রমথনাথ বিশী, 'নাট্যকার গিরিশচন্দ্র', *নাট্যসাধক গিরিশচন্দ্র*, অপূর্ব কুন্ডু সম্পাদিত, বর্ণালী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২১৯) তা সত্ত্বেও

'ঘটনাবহুল ইতিহাসের অক্ষুণ্ন উজ্জ্বল চিত্র সিরাজদ্দৌলা নাটকে দেখিতে পাই, অন্য কোন নাটকে এমন ইতিহাসের পরিষ্কার যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই না, অথচ নাটকীয় সৌন্দর্য্যেও কোথাও সামান্য ত্রুটি ঘটে নাই'। (মাখনলাল সেন, 'সেক্সপিয়ার ও বাংলার নাট্যকার', *নাট্যসাধক গিরিশচন্দ্র*, অপূর্ব কুন্ডু সম্পাদিত, বর্ণালী, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৩০)

২৮. পুষ্পেন্দু শেখর গিরি, *সিরাজদ্দৌলা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৫

২৯. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, *সিরাজদ্দৌলা*, পুষ্পেন্দুশেখর গিরি সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৩৯

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

৩১. মুঘল বাদশাহের বাংলা আক্রমণের সংবাদ, ইংরেজদের দৌরাত্ম্য, সওকতজঙ্গের বিদ্রোহ, রাজবল্লভ-ঘসেটির চক্রান্ত, রাজন্যবর্গের ষড়যন্ত্র, মিথ্যা জনশ্রুতি ইত্যাদি নানাবিধ কারণে রাজ্যের ক্ষমতাধর মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ কিংবা অন্যদের চক্রান্ত বুঝতে পেরেও শাস্তি দেয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে।

৩২. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১

৩৪. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩৫. শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৪

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৪

৩৭. সিকান্দার আবু জাফর, *সিরাজ-উ-দ্দৌলা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৭, পৃ. ২৭

৩৮. মাহবুবা সিদ্দিকী, *সিকান্দার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৬

৩৯. সিকান্দার আবু জাফর, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী* ২, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৫২

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৪২. মাহবুবা সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৮

৪৩. সিকান্দার আবু জাফর, ১৯৯৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৪৬. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৭

৪৭. 'এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাত জন গোরা, ষোল জন সেপাই মরেছে; তেরো জন গোরা আর ছত্রিশ জন সেপাই জখম হয়েছে। একটা ছোটখাটো দাঙ্গায় এর চেয়ে ঢের বেশি লোক মরে।' (তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, *পলাশির যুদ্ধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০১৪, পৃ. ১৫৮)

৪৮. নাটকটির চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, 'নাটকটির যে ত্রুটি নজরে পড়ে তা এর চরিত্রাবলীর একমাত্রিকতা। চরিত্রাবলী দুই শ্রেণীর ভাল ও মন্দ। ভাল চরিত্র যেমন: সিরাজ, মোহনলাল ধর্মপ্রাণ, দেশপ্রেমী। মন্দ চরিত্রের আবার দুটো ভাগ : ইংরেজ কাপুরুষ, সুযোগ-সন্ধানী আর ষড়যন্ত্রী বাঙালিরা স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক। নাটকের পূর্বাপর আপন আপন একমাত্রিক চরিত্রগুণ থেকে প্রায় কেউই বিচ্যুত নয়।' মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "সিকান্দার আবু জাফরের সাহিত্যসাধনা", 'বই', জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৭, পৃ. ৩

৪৯. মোঃ জাকিরুল হক, *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৫

৫০. 'শেষ নবাব' নাটকের 'প্রসঙ্গত' নামক ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৫১. বিশ্বজিৎ ঘোষ, *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮-১৫৯

৫২. সাঈদ আহমদ, *শেষ নবাব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৯

৫৩. 'সিরাজ পলাশীতে হেরে গেছে বলে দেশ হেরে যায়নি। এ যুদ্ধ অনন্তকালের। এদেশে অনেক সিরাজ জন্ম নেবে, প্রতিশোধ নেবার জন্য। মীরজাফর আমি অভিশাপ দিলাম তোমার নাম এদেশে অনাদিকাল পর্যন্ত ধিকৃত হয়ে থাকবে।' (সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২)

৫৪. 'রাজবল্লভ : অপমানের প্রতিশোধ নিতে, দেশের স্বার্থে যে কোন বলিদান দিতে কুণ্ঠাবোধ করা উচিৎ হবে না।' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩)

৫৫. মীরজাফর অতীতে আলীবর্দীর বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছিল। আলীবর্দী রাজনৈতিক কারণেই তাকে ক্ষমা করেছিল। সিরাজদ্দৌলাও একবার বিদ্রোহ করেছিলেন। এমনকি আলীবর্দী নিজেও তাঁর মুনিব সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সিংহাসন দখল করেছিল। সিংহাসনের জন্য নিজ নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ইতিহাসে পুরাতন ঘটনা। তাই মীরজাফরও সেনাপতি হিসেবে নিজেকে মসনদের দাবিদার মনে করেছে।

৫৬. সাঁফ্রের সাথে কথোপকথনকালে– 'তবু আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। এত সাধারণ অবস্থা থেকে যে পলাশী পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সে ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নয়, সাঁফ্রে।' (সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫)

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৫৮. মীর হুমায়ূন কবীর, *সিকান্দার আবু জাফর ও সাঈদ আহমদের নাটক*, ভাষা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১০৫

৫৯. সাঈদ আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে নায়কহীনতা: রাজনৈতিক সূত্র বিচার

মাফরুহা সিফাত*

সারসংক্ষেপ

প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসও ছিল বীরদের দখলে। সেসব চরিত্রের পরিণতি হয় জয়ী হওয়া, না হয় বীরত্বপূর্ণ পরাভব। ক্রমশ বৈশ্বিক গতিপথের নানা বাঁক পরিবর্তনে সাহিত্যের নায়ক-চরিত্র নির্মাণেও কৃত্রিমতা অনেকটা বিবর্জিত হয়ে যেসব মানবমুখী ধারা প্রবর্তিত হলো, সেসবও বিশেষ কোনো তত্ত্ব বা আদর্শের প্রচারক। পরবর্তীকালে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে মানুষের অন্তর্লোক বেশি প্রাধান্য পাওয়ায় নায়কত্বের আড়ম্বরতা কমে গিয়ে মানবসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশে নির্মিত হয়েছিল প্রতি-নায়কদের (anti-hero) চরিত্র। বাংলা উপন্যাসেও বিশ্ব সাহিত্যের এই ধারার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে উপন্যাসগুলো প্রকৃষ্টরূপে 'নায়কহীন' মাত্রা অর্জন করে ঐ শতকের চল্লিশের দশক থেকে। আর এই চর্চা প্রগাঢ় মূর্তি ধারণ করেছে বাংলাদেশের সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনার মাধ্যমে। বলা যায়, তাঁর *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস তিনটি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেও নায়কহীন রচনার অনন্য নিদর্শন হওয়ার যোগ্য। নায়ক নয়, বিরোধী-নায়কও নয়, বরং কোনো ধরনের আরোপ বিবর্জিত অকৃত্রিম মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে ওয়ালীউল্লাহ্ নির্মাণ করেছেন মজিদ, আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফা–চরিত্রগুলো। এসব চরিত্র সৃষ্টির পেছনে প্রণোদনা তাঁর চৌকস বিশ্ববীক্ষা, অসামান্য স্বদেশপ্রেম এবং সমাজ ও রাজনীতিসচেতন সদাজাগ্রত মানবিক সত্তা। তাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাংলা উপন্যাসগুলোর রাজনৈতিক সূত্র অনুসন্ধান। পাশাপাশি তত্ত্বীয় বা আদর্শগত বিচারের ঊর্ধ্বে তাঁর উপন্যাসসমূহের প্রধান চরিত্রগুলোকে নায়কহীন অবয়বে বিশ্লেষণ করাও এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১

এলাম-দেখলাম-জয় করলাম–ধরনের প্রবণতায় সাহিত্যমঞ্চ ঠাসা ছিল প্রায় কয়েকশ বছর জুড়ে। আর সেই আসরের প্রধান ছিল কাব্য-নাটক-উপন্যাসের তথাকথিত 'নায়ক' চরিত্রগুলো। এসব চরিত্রের কেউ ছিল দেবতা, কেউ রাজা বা রাজপুত্র, কেউ ধর্মপ্রচারক অথবা কেউ ক্ষমতাধর শাসক, যোদ্ধা বা দুর্ধর্ষ সেনাপতি। এছাড়াও সেই তালিকায় আরও অন্তর্ভুক্ত ভূ-পর্যটক, নাবিক বা সওদাগরের মতো চরিত্রসমূহ, যারা অসীম সাহসে সমুদ্রবিজয়সহ যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবিলা করত । তবে প্রথমে ইউরোপীয় রেনেসাঁ, তারপর ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এবং পাশাপাশি আঠারো শতকের মাঝামাঝি শুরু হওয়া শিল্পবিপ্লব ও যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে ক্রমান্বয়ে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে জটিল, দ্বান্দ্বিক ও কোলাহলপূর্ণ। সুতরাং, আঠারো শতকের শেষ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রায় পুরোটা জুড়ে সাহিত্যে নায়কদের বীরত্বগাথা তেমন উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত না হলেও, অন্যধারায় গ্রন্থিত হয়েছে নায়কোচিত ভাববাদ ও আদর্শবিশিষ্ট প্রচারমুখী চরিত্রসমূহ।

---

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারপর অল্প কয়েকবছরের ব্যবধানে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-১৯৪৫) ভয়াবহতা। সেই উত্তাপ এসে গায়ে লাগে সাহিত্যেরও। তখন থেকেই সাহিত্যের নায়কদের অস্তিত্বসংকট ও অন্তঃসারশূন্যতা দেখা দেয়। কিন্তু, প্রধান চরিত্রগুলোর শরীর থেকে 'নায়ক' আবরণটি খসে পড়তে সময় লেগে যায় আরও বহুবছর। এই যাত্রার মাঝপথে শুরু হয় 'অ্যান্টি-হিরো'দের পদচারণা। অর্থাৎ, 'নায়কে'রা এক্ষেত্রে বিপরীত পথগামী হয়ে উঠলেও 'হিরোইজম'টা রয়েই যায় পরিচয়ের অভ্যন্তরে। তবে জনসমাজের নির্মাণ ও ভাঙনের এই প্রবল স্রোতধারায়; ইতিহাস-সমাজ-রাষ্ট্র ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসার গভীরবোধে উৎসারিত হয়ে আরও বেশ কয়েকবছর পর থেকে, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে সাহিত্যিকগণ বহুমাত্রিক অন্বেষণের মাধ্যমে পরাভূত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে একের পর এক সৃষ্টি করতে থাকেন নায়কহীন রচনাগুলো। বিশেষ করে উপন্যাস-সাহিত্যে নায়কহীনতার এই চর্চা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে। ক্রমশ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো উঠে আসতে থাকে একেবারেই সমাজের সাধারণ মানুষদের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। অনেকসময় চরিত্রগুলো এমন শ্রেণিকে প্রতিনিধিত্ব করেছে, জনস্রোতে যাদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করাই অসম্ভব।

এইসব মানুষের টিকে থাকার লড়াই কিংবা জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়ার কোনোরূপ নাটকীয়তা-বিবর্জিত সাদামাটা ঘটনাগুলো নিয়েই রচিত হয়েছে অসংখ্য উপন্যাস-বিশ্বসাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যেও। আর নায়কহীন রচনা সৃষ্টির এই ধারায় বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) উপন্যাসগুলোকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। ওয়ালীউল্লাহ্ রচিত *লালসালু*-র (১৯৪৮) মজিদ, *চাঁদের অমাবস্যা*-র (১৯৬৪) আরেফ আলী এবং *কাঁদো নদী কাঁদো*-র (১৯৬৮) মুহাম্মদ মুস্তফার কেউই নায়ক নয়। 'হিরো' কিংবা 'অ্যান্টি-হিরো' কোনো বিশেষণই তাদের জন্য উপযুক্ত নয়। তারা একেকজন অতি-সাধারণ মানুষ। তবে বিশেষভাবে বলতে গেলে, এরা প্রত্যেকেই একই সূত্রে গাঁথা। আর তা হলো, পরাভবের যন্ত্রণায় কাতর জীবনযুদ্ধের সৈনিক। কালোত্তীর্ণ এসব চরিত্রের সঙ্গে সমাজের আর আট-দশজন মানুষের জীবনকে সহজেই মেলানো সম্ভব:

> সর্বভারতীয় কাঠামো কিংবা সর্ববঙ্গীয় পরিসরের মধ্যেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডের নিম্নবর্গীয় মানুষের বঞ্চনাবোধকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন, ভেবেছেন তাদের বঞ্চনামুক্তির কথা। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণের মর্মকে, তাদের 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতির নির্মম অভিঘাত এবং কুফলকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিসহযোগে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতার সঙ্গে ঔপনিবেশিক শক্তির এই শাসননীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিন্যাস নিয়েও তিনি ছিলেন অসাধারণভাবে সচেতন।[১]

যদিও উপন্যাসের শরীর গঠনের প্রয়োজনে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলোর প্রত্যেককেই একেকটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে পথ হাঁটতে হয়েছে। তবে তাদের সেই জীবনসত্যগুলোর আড়ালে কলকাঠি নাড়ছিল সমাজসত্য বা আরও বৃহদাকারে বলতে গেলে রাজনৈতিক সত্য। আর এই সত্য তাদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

২

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ঠিক কী কারণে, কীভাবে এবং কী পদ্ধতিতে উপন্যাসের চরিত্রদের নায়কোচিত আভরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন, তা জানতে ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হয়। যেমনটা প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে, একটা সময় পর্যন্ত সাহিত্যের ইতিহাস বলতেই ছিল বীরদের কাহিনি। যেটা শুরু হয়েছে অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের *বেওয়ুল্‌ফের (Beowulf)* বীরগাথা দিয়ে। একদিকে কলম্বাসের মতো ইতিহাসের বীরগণ সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে নতুন নতুন অঞ্চল জয় করেছে, অন্যদিকে সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে তাদের মহান শৌর্য-বীর্যের আদর্শ। রাজ-রাজড়াদের রাজ্যজয় আর দেবতাদের মর্ত্যজয়–এই-ই ছিল তখনকার কাব্য-মহাকাব্যের মূল উপজীব্য। একদিকে ইংল্যান্ডে চসারের কালে 'বুর্জোয়া' যুগের সূচনা হয়, অপরদিকে রচিত হতে থাকে গ্রিকবীরদের উপাখ্যান-মালা। এরপর দার্শনিক জন উইক্লিফের (John Wycliffe) হাত ধরে কিছুটা 'রিফরমেশন' শুরু হয় এবং তার পরপরই রেনেসাঁর আলোয় আলোকিত হতে শুরু হওয়া মানবসমাজে ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা হতে দেখা যায়। কিন্তু, সেই প্রভাবে লিখিত সাহিত্যকর্মগুলো এমনকি টমাস ম্যুরের (Thomas More) *ইউটোপিয়াও (Utopia)* মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি তেমনটা।

পরবর্তীকালে টমাস কিড (Thomas Kyd), ক্রিস্টোফার মারলো (Christopher Marlowe), শেক্সপীয়র (William Shakespeare) তাঁদের লেখার মাধ্যমে সাহিত্যকে অনন্য মাত্রা দান করলেও তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর বেশিরভাগই ছিল ঐতিহাসিক, পৌরাণিক এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কারণ, নাটক কমেডি হোক অথবা ট্রাজেডি, সবকিছুরই মানস-বিলাস ছিল কৃত্রিম 'বীরপনার' আদর্শচর্চা। 'হিরোইক ট্র্যাজেডির প্রধান রূপ হল দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন একরোখা একটা বীরত্ব– আত্মোৎসর্গের চিত্র। সব পাত্রই এই-ছাঁচে ঢালা 'লৌহ-ভীম'।'[২] এই প্রভাব রয়ে গিয়েছিল প্রায় *গালিভার ট্রাভেলস্ (Gulliver's Travels)* কিংবা *রবিনসন ক্রুশো (Robinson Crusoe)* রচনার সময় পর্যন্ত।

যাই হোক, ফরাসি বিপ্লবের পর বিশ্বসাহিত্য বেশ কিছুটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাতে সাহিত্যের নায়ক চরিত্রগুলোর আভিজাত্য চূর্ণ হয়েছিল অনেকটাই। আঠারো ও উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের প্রথমাংশ অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) সময় পর্যন্ত সাহিত্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নানাবিধ প্রয়াস দেখা গেছে স্বল্পমাত্রায়। ফলে সাহিত্যকর্মগুলোতে একজন 'নায়কে'র থেকে অনেক সময়েই প্রাধান্য পেয়েছে সামগ্রিক মানবজাতি। কিন্তু, তবুও ততক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্যে 'নায়ক' তার পদ হারায়নি। যদিও রুশো (Jean-Jacques Rouseau), ভলতেয়ার (Voltaire), দিদেরো (Denis Diderot) এবং মন্টেস্কুর (Montesquieu) সমাজ ও রাষ্ট্র-দর্শন; বিপ্লব এবং মানবাধিকারের ধারণাকে পুষ্ট করার মাধ্যমে সামষ্টিক চেতনার জাগরণ ঘটাচ্ছিল। তবে, এই জাগরণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে 'নায়ক'রা আর 'বীর' রইল না বটে, কিন্তু হয়ে উঠল বেশি মাত্রায় 'আদর্শ মানুষ'। সাহিত্যে এসব মানুষ হয়ে উঠল গণমানুষের মুক্তির প্রতীক, মানবপ্রেমের উপাসক। এখানেই পরিলক্ষিত হয় রোমান্টিক নবযুগের দীনতা। এদিকে ডারউইনের (Charles Darwin) বিবর্তনবাদ (The Theory of Evolution) যেমন বৈজ্ঞানিক সাধনার পথ উন্মুক্ত করল, মার্কসবাদ-

দীক্ষিত মানুষেরা সমাজ-সচেতনতার আরেক ধরনের বার্তা ছড়াল। ফলে ধনতন্ত্রের সংকটে ও সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ে সাহিত্যও পেল এক নতুন মাত্রা। নানা তত্ত্ব-উপাত্তের বুননে আঙ্গিকপ্রধান সাহিত্য রচিত হতে থাকল, যেখানে মানুষের বহির্জগতের চেয়ে অন্তর্লোক পেল বেশি প্রাধান্য। সুতরাং, এসবের প্রভাবে বিশ শতকের শুরু থেকে উপন্যাসগুলো রচিত হয়েছিল ব্যক্তিক-সংকটকে প্রাধান্য দিয়ে। এই ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন জেমস জয়েস (James Joyes), ভার্জিনিয়া উলফ (Virginia Woolf), ই. এম. ফস্টার (E. M. Forster), ডি. এইচ. লরেন্সের (D. H. Lawrence) রচনাগুলো।

অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যেও দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, অলৌকিক ঘটনার ঘনঘটা, রাজ-রাজড়াদের রাজত্ব জয়ের গৌরবগাথাপূর্ণ মধ্যযুগ পেরিয়ে বঙ্গীয় রেনেসাঁর ধারায় আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সূচিত উপন্যাসের ধরনটিই চর্চিত হয়ে এসেছে বহুকাল জুড়ে। সেই ধরনটি অবশ্যই বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তবে আধুনিকতার উন্মুক্ত প্রবাহ থেকে ধারাটি কিছুটা বিচ্ছিন্ন। এমনটাই বলেছেন দেবেশ রায়।[৩] তিনি আরও বলেছেন, বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার প্রক্রিয়াটি ঐতিহাসিক। তবে লেখকের ব্যক্তিগত অর্জনকে তিনি সেই প্রক্রিয়ার অংশ ভাবতে নারাজ। তাঁর মতে, 'বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক ও সতীনাথের ব্যক্তিগত সিদ্ধি সত্ত্বেও উপন্যাসের আধুনিকতার জন্মবিভ্রান্তি মিথ্যা হয়ে যায় না।'[৪] তবে দেবেশ রায় মনে করেন, মানিক, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের হাতে বাংলা উপন্যাসের এক নিজস্ব প্রবণতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তবুও তাঁর *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*-গ্রন্থে তিনি বাংলা উপন্যাসের দীনভাব কাটিয়ে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি সমসাময়িক রাজনীতি ও ব্যক্তিমানুষের নিয়তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত—এমন উপন্যাসকেই আদর্শ উপন্যাসের তকমা দিয়েছেন। *ডন কুইকসোট (Don Quixote)*, *টম জোন্‌স (The History of Tome Jones)*, *স্কারলেট এ্যান্ড ব্লাক (Scarlet and Black)*, *হিউম্যান কমেডি (The Human Comedy)*, *ওআর এ্যান্ড পিস (War and Peace)*, *আনা কারেনিনা (Ana Karenina)*, *ক্রাইম এ্যান্ড পানিশমেন্ট (Crime and Punishment)*, *দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ (The Brothers Karamazov)* প্রভৃতি উপন্যাসকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে[৫] তিনি মত প্রকাশ করেছেন এভাবে:

> উপন্যাসের অন্বিষ্ট সমাজ নয়, সময় নয়, ইতিহাসও নয়। উপন্যাসের অন্বিষ্ট ব্যক্তিমানুষ। এই সমাজ, সময় আর ইতিহাস ব্যক্তিমানুষের চরিত্র ও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল করে দেয়। ফলে মানুষের সংজ্ঞা বারবারই নতুন করে খুঁজতে হয়। তাই মানুষকে খুঁজতে গিয়ে এই সমাজ, সময় আর ইতিহাসকেও খুঁজতে হয়। সমাজ, সময় আর ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষ হচ্ছে উপন্যাসের অন্বিষ্ট।[৬]

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে, যুদ্ধ যখন বাংলাদেশের দোর-গোড়ায় এসে উপস্থিত হল, তখন থেকেই বাংলা উপন্যাসও অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন।'[৭] তবে দেশভাগের পর সমগ্র বাংলা সাহিত্য থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে পূর্ববাংলার ভূখণ্ডে বাংলাদেশের সাহিত্য নামে এক আলাদা ও আপাত গতিশীল পথের সৃষ্টি হলো। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগজনিত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ পথ

অতিক্রম করে বাংলাদেশের উপন্যাস যাত্রা শুরু করেছিল বলে, সূচনালগ্ন থেকেই এসব লেখায় নায়কোচিত নাটকীয়তা এমনিতেই কম ছিল। আর সার্বিক বিবেচনায় সেই পথের অন্যতম উৎকৃষ্ট পথিক ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্‌, সেই সূচনালগ্ন থেকেই:

> বস্তুত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিষয় ও প্রকরণগত উৎকর্ষ-জ্ঞান, দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সবিশেষ পরিচিতি, সমাজ-সংগঠন ও মানব-অস্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কিত ধারণা, এবং এ সবের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তর ক্রিয়ার মাধ্যমেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনদর্শন হয়েছে বিকশিত, ক্রম-রূপান্তরিত হয়েই প্রজ্ঞাময় সত্তায় সংহত।[৮]

সুতরাং, বহুবর্ণিল জীবনের শুরু থেকেই ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন বৈচিত্র্যময় জ্ঞানপিপাসু। আর তাঁর জ্ঞানচর্চার মূলে ছিল স্বদেশ-সমাজ-মানুষ।

৩

জন্মসূত্রে পাওয়া উন্নত শ্রেণির জীবনধারা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ কর্মসূত্রেও প্রবাহিত করেছিলেন নিজস্ব প্রজ্ঞায়। কিন্তু শুরু থেকেই তাঁর ছিল মাটির প্রতি টান। তাই তিনি কখনোই জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন না। বরং, দেশ ও বিশ্বের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘটনাবলির অভিঘাতে আন্দোলিত গণমানুষের জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে, সমবয়সী অনেকের তুলনায় তিনি ছিলেন অধিকমাত্রায় সচেতন। বিশেষ করে তৎকালীন বাংলার মানুষদের যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ তাকে আলোড়িত করত সবসময়। সৈয়দ আবুল মকসুদের বর্ণনায়:

> বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০-এর মন্বন্তর, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতার আন্দোলন, হিন্দু-মুসলমান ঝগড়া, অর্থনৈতিক মন্দা, অর্থাৎ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় সাধারণভাবে ভারত বিশেষভাবে বাংলা এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। এ অবস্থায় কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে নিস্পৃহ থাকা অসম্ভব কিন্তু নির্জন স্বভাবের ওয়ালীউল্লাহ্‌ ছিলেন যে-কোনো রকম কোলাহল থেকে দূরে, তবে শারীরিকভাবে ও সরাসরি না থাকলেও মানসিক দিক থেকে তিনি ছিলেন অনেক সমস্যার নিকটবর্তী, সমস্যা দ্বারা পীড়িত ও আন্দোলিত।[৯]

এরই সঙ্গে ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের অফিসের সেক্রেটারি পদে কাজ করার সময় তাঁর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ ঘটে। তখন এসব অঞ্চলের দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে উত্থানপর্ব চলছিল, যা তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। পাশাপাশি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কেও সমসাময়িকদের তুলনায় তাঁর জানাশোনা ছিল অনেক বেশি। এমনকি ষাটের দশকে ধীরে ধীরে অবনতির পথে এগিয়ে যাওয়া এশিয়ার দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থাও তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।[১০]

এ-রকম পরিস্থিতিতে রচিত সাহিত্যসমূহে তাঁর অন্তর্গত সত্তার প্রতিফলন ঘটবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণজনিত পরিপ্রেক্ষিতটি আড়ালে রয়ে গেছে। অথচ, তাঁর প্রত্যেকটি সাহিত্যকর্মের রয়েছে রাজনৈতিক উৎসমুখ। যদিও-

> রাজনৈতিক-সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করা তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তবু সময়ের উত্তাপকে চেপে রাখা যায় না, মহৎ শিল্পীর শিল্পভুবনে তার আঁচ নানাভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। কথাটিকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে এ-ভাবে বলা

> যায় যে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির ডামাডোলকে উপেক্ষা করলেও আধুনিক কালের জীবন ও সময়সতর্ক শিল্পীরা রাজনৈতিক চেতনাকে মননে-সৃজনে ধারণ না করে পারেন না।[১১]

সুতরাং, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌কে নিয়ে আলোচনায় তাঁর পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানকে বড়ো করে তুলে, তাকে কাফ্‌কা-কাম্যু-সার্ত্রে (Franz Kafka-Albert Camus-Jean-Paul Sartre) প্রভাবিত লেখক হিসেবে বিবেচনা করে; তাঁর লেখায় পাশ্চাত্য তত্ত্ব ও দর্শনের খোঁজ করাটা গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একমাত্র অভিজ্ঞান নয়। বরং তাঁর লেখাগুলো, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসগুলো বৃহৎ পরিসরে রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। কিন্তু, অনেকক্ষেত্রেই পঠনপাঠনের সীমাবদ্ধতায় রাজনৈতিক উপন্যাসের একপাক্ষিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই বিভ্রান্তির অবসান হতে পারে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে:

> প্রচলিতভাবে যেসব উপন্যাসকে আমরা রাজনৈতিক উপন্যাস বলি তার অধিকাংশ কনজাংচারাল; কোন রাজনৈতিক ঘটনা-আন্দোলন-প্রত্যক্ষ আদর্শের ছায়ায় তারা নির্মিত: কিন্তু গভীর স্তরের রাজনৈতিক উপন্যাস অর্গ্যানিক। প্রসঙ্গত কোন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ না থাকলেও একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রা অর্জন করতে পারে ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে। অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার উন্মোচনে, অভিজ্ঞান সন্ধানে, জনসমাজের নির্মাণ-ভাঙনের চেতনায়, এমন কি ধর্মীয় জিজ্ঞাসার বহুমাত্রিক অন্বেষণেও উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে রাজনৈতিক।[১২]

এরই সূত্র ধরে *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* এবং *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র-ত্রয় নির্মাণে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র রাজনৈতিক বীক্ষণের সমান্তরালে মজিদ, আরেফ আলী এবং মুহাম্মদ মুস্তফার নায়কহীন পদযাত্রার গতিপ্রকৃতির মর্মমূলে প্রবেশের পূর্বে, তাঁর বিশ্ববীক্ষা সম্পর্কে স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র অভিমতটিও জেনে নেওয়া প্রয়োজন:

> বিশ্ব নাগরিক হিসেবে পৃথিবীর সব সাহিত্যকে ও নিজের সাহিত্য বলে গণ্য করত। তাদের চিন্তা, তাদের পদ্ধতি বা তাদের কাছ থেকে যা কিছু সে আদায় করতে পেরেছে, তার সবই সে তার নিজের সংস্কৃতি ও মানুষ-পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের ওপর প্রয়োগ করত। ও তার লেখার মাধ্যমে ওর দেশের মানুষের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য যতটা সম্ভব ভূমিকা রাখতে চাইত।[১৩]

বিশেষ করে ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চিন্তাজগত আচ্ছন্ন করেছিল পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষেরা। তাই তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে সেই ধরনের চরিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, তাঁর ভারতীয় বন্ধু হৃষীকেশ লাহিড়ীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন:

> পাকিস্তান ও ভারত আজ করুণভাবে খাটো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থায়ী বিচ্ছেদের ভবিষ্যৎ দুঃখজনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন রক্ষার জন্য এই অস্ত্রোপচার অনিবার্য ছিল। যদি আমরা শুধু এই অস্ত্রোপচারের জরুরি দরকারটাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারতাম![১৪]

এই 'অস্ত্রোপচার' তথা দেশভাগ-পরবর্তী যন্ত্রণাকে সমূলে ধারণ করেছিলেন বলেই তারই প্রতিফলন হিসেবে, তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোকে তীব্র জীবনযন্ত্রণার দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি। এ যেন তাঁর বোধেরই বহিঃপ্রকাশ! এদিকে হবীবুল্লাহ্‌ বাহারকে *বাহারদা* সম্বোধন করে লেখা তাঁর একটি রচনায় তিনি বলেছেন:

> আমাদের মুসলমান সমাজ বহুদিন একটি ছকবাঁধা জীবনযাপন করে এসেছে, এখনো করে যাচ্ছে। তাতে ব্যতিক্রম ঘটতে শুরু করেছে বলা যেতে পারে। সমাজের এ অবস্থাটি মানুষের আরোগ্যোত্তর অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই সময়ে মানুষের জীবন নিয়মানুবর্তিতার কড়াকড়িতে বাঁধা পড়ে, বিষয়টা এই যে একটু অসাবধান হলে, চিকিৎসকের কথা অমান্য করলে দু-কদম হাঁটার নির্দেশ ভঙ্গ করলে তিন কদম হাঁটলে কী যে হবে বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এ-সময়ে জীবন ধারণ করা সম্ভব হয় হয়তো, তবে তেমন জীবন থেকে সফলতা মৌলিকতা কিছু আশা করা যায় না। সমগ্র জীবনটা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভীত মানুষের জীবন থেকে কোনো প্রকার অবদান আশা করা দুরাশা মাত্র।[১৫]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, বাঙালি মুসলমানদের জীবন নিয়ে তাঁর চিন্তার পরিধি ছিল বিস্তৃত। এই প্রসঙ্গে আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্‌র অভিমত: 'ধর্মীয়ভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সে বাঙালি মুসলমানই ছিল।'[১৬] তাই মজিদ, আরেফ আলী এবং মুহাম্মদ মুস্তফা— তিন চরিত্রেই সদ্য স্বাধীন ভূখণ্ডের সাধারণ বাঙালি মুসলমানের প্রতিচ্ছবি মেলে, যারা ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপরি-উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী জীবন কাটিয়েছে প্রবল নৈরাশ্য এবং অদ্ভুত এক দমবন্ধকর উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যে।

৪

নিজের উপন্যাসগুলো নায়কহীন করে তুলতে ওয়ালীউল্লাহ্‌কে অনেক অন্তদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিতধীসম্পন্ন এই লেখক বহির্জগতের অনুসন্ধিৎসু চেতনা দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে শুধু বাংলাদেশের উপন্যাস নয় বরং বিশ্ব উপন্যাসের ধারায় অন্যতম এবং ভিন্নমাত্রিক এই চরিত্রসৃজন কৌশলে উৎসাহী হয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্রদের কেউই বীরত্বপূর্ণ 'হিরো' নয়। নয় তারা সাহিত্যের নায়কদের চিরায়ত শ্রেণিবিভাগসমূহের অন্তর্গতও।[১৭] তবে তারা কেউই আবার 'অ্যান্টি-হিরো' কিংবা 'ভিলেন'ও (villain) কিন্তু নয়। এমনকি মজিদের কর্মকাণ্ডে সাধারণ পাঠকদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে তাকে ভিলেন বলে মনে হলেও, অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তাকে এমনকি 'অ্যান্টি-হিরো' বা 'অ্যান্টাগোনিস্ট'ও (antagonist) বলা যায় না। 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ *লালসালু* উপন্যাসকে সময় ও সমাজের বস্তুগত সত্যের ওপর স্থাপন করেছেন। ফলে মজিদের প্রতি তার কোনোরূপ ঘৃণা বা অসন্তোষের প্রকাশ ঘটেনি উপন্যাসে।'[১৮]

মজিদ, আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফা কেউ আগামেমনন (Agamemnon), ঔদিপাস (Oedipus), ঔদিসিয়াসের (Odyssey) মতো নয়। কিংবা তারা রাসকলনিকভ (Raskolnikov), হ্যামলেট (Hamlet) বা হাকলবেরি ফিনও (Huckleberry Finn) নয়। তাদের গোরা বা মহেন্দ্র, বিহারী বা নিখিলেশ, সন্দীপ বা সুরেশ, দেবদাস বা শ্রীকান্ত, শশী বা হোসেন মিয়া ধরনের ভাববাদী, বস্তুবাদী, জাতীয়তাবাদী, রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ, বিপ্লবী, দেশপ্রেমী কিংবা প্রবল স্বার্থান্বেষী, কুচক্রী, অর্থলোভী অথবা অ্যাবসার্ড কোনো ধরনের একক 'আদর্শে'র চরিত্রের ছাঁচে ফেলা যায় না। বরং ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগুলোর প্রধান চরিত্ররা তৎকালীন সমাজ-রাষ্ট্রিক কাঠামোর অন্তর্গত অথচ স্থানিক পটভূমি বিবেচনায় বহির্জগতের বাসিন্দা। যারা সিসিফাস শ্রমে শোধ করে চলেছে জীবনের দেনা। কারণ সমাজের প্রান্তবাসী চরিত্র যুবক শিক্ষক আরেফ আলী ও ছোট হাকিম মুহাম্মদ

মুস্তফাকে যেমন শাসকগোষ্ঠীর সামষ্টিক এবং সামগ্রিক নির্মমতার বলি হতে হয়েছিল। যাপিত জীবনে এরকম বহু সাধারণ মানুষের পরাভবের ইতিবৃত্ত আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরেই রয়ে যায়:

> এম্নিতে মুহাম্মদ মুস্তফা নির্বিবাদী ও অক্রিয় (passive) ধরনের চরিত্র। কিংবা বলা চলে, তার অক্রিয়তার মধ্যেও রয়ে গেছে সক্রিয়তার বীজ–সে হচ্ছে তার চেতনা, যা তাকে এক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত করে দ্যায়।[১৯]

আর নায়কোচিত আড়ম্বর বিবর্জিত এসব মানুষদের জীবনকথাই হয়ে উঠেছিল ওয়ালীউল্লাহ্‌র বাংলা উপন্যাসসমূহের প্রধান উপজীব্য। বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে তিনি যে কোনো ধরনের অ্যাবসার্ড জীবনযাত্রা থেকে সচেতন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন যোজন যোজন দূরে। শেষপর্যন্ত অভিজ্ঞতাবাদের সর্বশেষ প্রান্তে গিয়েও মানুষ ও জীবনের প্রতিই পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে চেয়েছেন তিনি।[২০] তাই সমাজের অনুল্লেখযোগ্য মানুষের মর্মকথা ও জীবনেতিহাসের অবিমিশ্রতায় রচিত হয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলোর পটভূমি।

৫

কোনো কোনো সমালোচক তাঁদের যুক্তিযুক্ত ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগুলোকে ফ্রান্‌জ কাফকার *দ্য ট্রায়াল (The Trial)*, আলবেয়ার কাম্যুর *দ্য প্লেগ (The Plague)* এবং *দ্য আউডসাইডারের (The Outsider)* সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এখন এই উপন্যাসগুলো বা কাফকা ও কামুর অন্য লেখাগুলো কতটা নায়কহীন হয়ে উঠেছে, সেটার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক। *দ্য ট্রায়ালের* প্রথম বাক্যেই দেখা যায়: Someone must have been telling tales about Josef K., for one morning, without having done anything wrong, he was arrested.[২১] এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ব্যাংকের কেরানি জোসেফ কে উপন্যাসের শুরুতেই গ্রেফতার হয়। কিন্তু উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত তার অপরাধটি অজানা রয়ে যায়। এদিকে পুরো উপন্যাসজুড়ে সে গ্রেফতার হয়ে থাকার পরও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে থাকে, একেবারে বিচারের রায় শোনার আগে তার মৃত্যু পর্যন্ত। অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচারে বলা যায়, উপন্যাসটি তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় কাঠামোর প্রতি কাফ্‌কার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কাফ্‌কার মতে, ব্যক্তিসত্তা তখন গৌণ ছিল। মানুষ জন্মের পর থেকেই এক অজ্ঞাত বিচারের মুখোমুখি দাঁড়ায়, যে বিচার চলতে থাকে আমৃত্যু। জোসেফ কে-র সঙ্গে যুবক শিক্ষক আরেফ আলীকে মেলানো যেতে পারে কিছুটা। কারণ তাকেও উপন্যাস জুড়ে একটি অপরাধই তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু আরেফ আলী তো অপরাধটি সম্পর্কে জ্ঞাত!

যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণে বলা যায়, ওয়ালীউল্লাহ্‌ কাফ্‌কার মতোই সমাজ ও রাষ্ট্রের অবদমনে পিষ্ট সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবেই জোসেফ কে-র মতো আরেফ আলী চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আরেফ আলীর জীবন জোসেফ কে-র মতো অ্যাবসার্ড বা প্রতীকী কোনো বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। বরং একজন নারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, সেই অপরাধের কারণ খুঁজে বের করা, অপরাধীর পক্ষে ও বিপক্ষে দাঁড়িয়ে দুভাবেই নিজের অবস্থান যাচাই করা এবং শেষে গিয়ে অন্য ব্যক্তির কৃতকর্মের ভার নিজে বহন করার মাধ্যমে বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি

দাঁড়ানোর এই পুরো প্রক্রিয়ায় তাকে জোসেফ কে-র মতো কোনো বিশেষ বার্তাবহ চরিত্র নয় বরং জীবনের দোলাচলে দুলতে থাকা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ মনে হয়েছে।

আলবেয়ার কাম্যুর *দ্য প্লেগ* উপন্যাসের প্রধান চরিত্র চিকিৎসক বার্নার্ড রিওর সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার তুলনা যুক্তিযুক্ত না হলেও ওরান শহরের সঙ্গে কুমুরডাঙ্গার তুলনা এই উপন্যাসের আলোচনায় অনেকটা প্রাসঙ্গিক।[২২] *দ্য প্লেগ* উপন্যাসের পটভূমি প্লেগ মহামারির শিকার ওরান শহর:

> Now, at least, the position was clear; this calamity was everybody's business. What with the gunshots echoing at the gates, the punctual thuds of rubber stamps marking the rhythm of lives and deaths, the files and fires, the panics and formalities, all alike were pledged to an ugly but recorded death, and, amidst noxious fumes and the muted clang of ambulances, all of us ate the same sour bread of exile, unconsciously waiting for the same reunion, the same miracle of peace regained. No doubt, our love persisted, but in practice it served nothing; it was an inert mass within us, sterile as a crime or a life sentence. It had declined on a patience that led nowhere, a dogged expectation.[২৩]

প্রায় মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত হওয়া বিচ্ছিন্ন সেই শহরে বার্নার্ড রিওর সামগ্রিক ভূমিকা ছিল মানবহিতকর এবং নায়কোচিত। পরিচিত-অপরিচিত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু তাকে মানসিকভাবে পর্যদুস্ত করেছে বারবার। মৃত্যুচিন্তা, হতাশা ও নৈরাশ্য তাকে গ্রাস করেছে। এসব বিবেচনায় রিওর সঙ্গে মুহাম্মদ মুস্তফার তুলনা হতে পারে। কিন্তু দুটো চরিত্রের উৎস, পটভূমি এবং পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক। ওরান শহরের আপাত বিচ্ছিন্ন দশার সঙ্গে কুমুরডাঙার কিছুটা সাযুজ্য রয়েছে, তবে সেটা তেমন তুলনাযোগ্য নয় এ কারণে যে, ওরানের অসংখ্য মানুষের জীবনে রিওর একটা সরাসরি প্রভাব ছিল প্লেগের বাস্তবতায়। কিন্তু মুহাম্মদ মুস্তফা এবং কুমুরডাঙ্গা–*কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসের দুটো পৃথক সমান্তরাল ধারা। ব্যক্তি মুহাম্মদ মুস্তফা রিওর মতো সামষ্টিক চিন্তার তৎপরতার জন্য কখনোই আলোচিত হয়নি। বরং কিছু পারিবারিক মৃত্যুর ঘটনাই তার জীবনের করুণ পরিণতির পেছনে ছিল ক্রীড়নক।

আরেফ আলী ছিল বড়বাড়িতে আশ্রিত। মুহম্মদ মুস্তফা কুমুরডাঙ্গায় এসেছিল জীবিকার তাগিদে। অন্যদিকে *লালসালু*-র মজিদও ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় মহব্বতনগর গ্রামে এসেছিল অন্য অঞ্চল থেকে। তাই যেসব স্থানগত প্রেক্ষাপটে আমরা তাদের পেয়েছি, সেখানকার সঙ্গে তাদের বাঁধন ছিল আলগা। তারা সেসব অঞ্চলে থেকেও যেন, ঐ অঞ্চলগুলোর কেউ হয়ে উঠতে পারেনি। এই উন্মূলিত দশার কারণে তাদের উপরি-উক্ত আলোচনায় 'আউটসাইডার' সম্বোধন করা যায়। কারণ, আলবেয়ার কাম্যুর *দ্য আউটসাইডারের* প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় শেকড়-বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিবেচনায়:

> Why should the death of other people or a mother's love matter so much? Why should I care about his god, the lives, the destinies we choose when one unique destiny had chosen me, and along with me millions and millions of privileged others who, like him, called themselves my brothers? Couldn't he understand, could he really not understand? Everyone was privileged. There was no one who wasn't privileged. All those others, they too would

> one day be condemned to death. He as well, he too would be, condemned to death. What did it matter if accused of murder he was executed for not crying at his mother's funeral?[২৪]

তবে জীবনের অর্থহীনতাকে নির্দেশ করে যে উদ্দেশ্যে কাম্যু তাঁর মারসো চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন, মজিদ, আরেফ আলী কিংবা মুহাম্মদ মুস্তফার কেউই সেই অর্থে তার মতো নিরাসক্ত 'অ্যান্টি-হিরো' নয়। বরং তারা প্রত্যেকেই যার যার প্রেক্ষাপট থেকে অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ চরিত্র। এছাড়া জীবনবৃত্তের বলয়ে এদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ক্ষেত্রে ছিল সমাজ-সম্পৃক্ততা। নিজেদের মনোজগতে ঘূর্ণায়মান প্রবল রক্তস্রোতকে উপেক্ষা করে সমাজস্রোতে নিজেদের অবস্থান চিন্তায় তাদের প্রত্যেকের আচরণেই কিছুটা হলেও ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে মজিদ ও আরেফ আলীর চরিত্রকে লেখক সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মুহাম্মদ মুস্তফা চরিত্রের বর্ণনা আমরা পাই দুজন কথকের মুখে। কিন্তু ওদিকে কাফকা ও কামুর উপন্যাসগুলোতে ছিল এক প্রবল 'আমিত্বে'র প্রভাব। আর 'আমিত্ব'মুখরতার ফলেই তারা ঠিক যে-কারণে নায়ক না হলেও বিরোধী-নায়ক হয়ে উঠেছিল, সেই 'আমি'র সঙ্গে 'সর্বজ্ঞে'র বৈপরীত্যে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসগুলো হয়ে উঠেছে নায়কহীন।

অন্তর্নিহিত সমাজসূত্র, গঠনশৈলী ও ভাষাবৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উপরি-উক্ত উপন্যাসত্রয়ের সঙ্গে ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসত্রয়ের বেশ কিছু মিল থাকলেও অমিলই বেশি। এবার নজর দেওয়া যাক এই উপন্যাসগুলোকে নায়কহীন করে তুলতে আর কী কী দ্বারা লেখক প্রভাবিত হয়েছিলেন। রাজনৈতিক সূত্র অনুসন্ধানের প্রশ্নে মানবসমাজে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব এড়ানো যায় না সহজে। রাষ্ট্রকাঠামো প্রণেতারা তাদের জনগণের সামনে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের দেয়াল তুলে স্বাধীনচিন্তার পথে প্রথমেই একটি প্রতিবন্ধক গড়ে তোলে। ফলে সাধারণ মানুষ মাত্রই জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসেব করতে থাকে পাপ-পুণ্যের পাল্লায়। মানুষের এই সরল ধর্মবিশ্বাস সমাজপতিরা এবং পোপ-পুরোহিত-পীর শ্রেণি প্রায়শই নিজের স্বার্থোদ্ধারে ব্যবহার করেছে যুগে যুগে। এসব ইতিহাস সম্পর্কে আর দশজন বিচক্ষণ মানুষের মতো ওয়ালীউল্লাহ্‌ও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসে মানুষের পক্ষপাতদুষ্ট পাপ-পুণ্যের বিচারের অসারতা প্রমাণের সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কাহিনি বিশ্লেষণে। ফিওদর দস্তয়ভস্কির (Fyodor Dostoevsky) উপন্যাসগুলোতেও এরকম কিছু চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা চলে, উপন্যাসের শরীরগঠনে ওয়ালীউল্লাহ্ দস্তয়েভস্কি দ্বারা প্রভাবিতও ছিলেন কিছুটা:

> There is only one salvation for you: take yourself up, and make yourself responsible for all the sins of men. For indeed it is so, my friend, and the moment you make yourself sincerely responsible for everything and everyone, you will see at once that it is really so, that it is you who are guilty on behalf of all and for all. Whereas by shifting your own laziness and powerlessness onto others, you will end by sharing in Satan's pride and murmuring against God.[২৫]

দ্য ব্রাদার্স কারামাজভ উপন্যাসের জনপ্রিয় ধর্মগুরু ফাদার যোসিমা উপরি-উক্ত বক্তব্যের মতো একাধিক ধর্মীয় বার্তা প্রচার করেন উপন্যাসের একটা বড়ো অংশজুড়ে। তার চরিত্রটি *লালসালু*

উপন্যাসের আওয়ালপুরের পীর এবং মজিদ চরিত্রের একটি সমন্বিত রূপ। যাদের মূল কাজ ধর্মভীরু মানুষকে কর্মফলের ভয় দেখিয়ে আরও বিচলিত করা। তবে ফাদার যোসিমার ভূমিকা পুরোপুরি নায়কোচিত। এদিকে মজিদ আপাদমস্তক ভুলত্রুটি, স্বার্থচিন্তায় পরিপূর্ণ চরিত্র। সে দেশভাগ-পরবর্তী সেসব বিচলিত ও দ্বিধাগ্রস্ত বাঙালি মুসলমানদের প্রতিনিধি, যারা যেকোনো মূল্যে টিকে থাকতে চায়। আবার আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফাও সদ্য স্বাধীন ভূখণ্ডের প্রত্ন-প্রতিম বাঙালি মুসলমানদের প্রতিনিধি স্বরূপ, যাদের জীবন কোনো তত্ত্ব বা কোনো আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের শরীরে যুক্ত হয়ে আছে জনসমাজের জীবনস্রোতে মিশে থাকা ছা-পোষা গন্ধবাহী বহিরাবরণ। এই বিবেচনায় নায়কত্বের কোনো সূচকেই তাদের স্থান নেই।

৬

এই পর্যায়ে, মজিদ, আরেফ আলী এবং মুহাম্মদ মুস্তফাকে নিয়ে যেই ঘরানার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সর্বাধিক, সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়। ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস সমালোচনায় পাশ্চাত্য তত্ত্বকাঠামোর আলোকে চরিত্রসমূহের নির্মাণজনিত বিচারের প্রবণতা সবচাইতে জনপ্রিয়। এটি ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার্যও নয়। তবে নতুনভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন, কেবল অস্তিত্ববাদ, চেতনাপ্রবাহরীতি ও অ্যাবসার্ডিজমের প্রয়োগ খুঁজতে গিয়ে, মজিদ, আরেফ আলী কিংবা মুহাম্মদ মুস্তফা–চরিত্রগুলোর প্রকৃত অভিমুখ অনুসন্ধান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা। এই চরিত্রগুলোর প্রত্যেকে লেখকের পাশ্চাত্যজাত চিন্তার ফসল এবং এটা তাদের বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও আদৌ তা আংশিক কৌশলমাত্র। তাই বলা বাহুল্য, উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে তত্ত্বের আলোকে বিচার করা গেলেও, এদের কাউকেই তত্ত্বপ্রচারক বলা যাবে না। কারণ, যে কোনো ধরনের প্রচারণাই নায়কোচিত কর্মকাণ্ডের শামিল। আর যা থেকে মজিদ, আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফা অনেকাংশেই বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বাংশেই মুক্ত।

প্রথমত, অস্তিত্ববাদী চিন্তার বিশাল আধারের সংক্ষেপ ভাবনায় বলা চলে, ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রায় সকলেই তাদের জীবনপ্রবাহের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। তবে এই সংগ্রাম সহজাত, কারণ মানুষ মাত্রই নিজেদের সচেতন বা অবচেতন মানসে অস্তিত্ব-সচেতনতায় পর্যবসিত এবং নিজের জীবনের স্বাধীন কাণ্ডারি।[২৬]

আবার, যেকোনো সাধারণ মানুষই বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাদের চিন্তাজগতকে অন্তত অনুকূলে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে চেতনে বা অবচেতনে। মানসলোকের টালটামাল অবস্থা সামলানো মাঝেমধ্যে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লেও জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের চেতনা অনেকটাই তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাই বিশেষ ধরনের কোনো মানুষই যে কেবল চেতনাপ্রবাহ রীতি দ্বারা প্রভাবিত, এই চিন্তায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের রূপরীতি নির্ধারণ করা পুরোপুরি সম্ভবপর নয়।

যাইহোক, উইলিয়াম জেমস (William James), ফ্রয়েড (Sigmund Freud), ইয়ুং (Carl Jung), জেমস জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফ–সকলের তত্ত্ব ও সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন ওয়ালীউল্লাহ্

। তাই তাঁর লেখা যে একেবারেই তাত্ত্বিক কাঠামোর প্রভাবমুক্ত তা নয়, বরং সমসময়ের ঐ জনপ্রিয় ও সুপরিচিত ছাঁচগুলোয় ফেলে, নিজের উপন্যাসগুলোকে তিনি সহজেই বিশ্বমানের করে তুলতে পেরেছিলেন। ফলে প্রকাশরীতির দিক থেকে *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসদ্বয়কে চেতনাপ্রবাহ রীতিসিদ্ধ নিরীক্ষাধর্মী উপন্যাস বলা গেলেও, চরিত্রগুলোর পরিণতি নির্ধারণে ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিকল্পনা কখনোই কোনো প্রথাবদ্ধ তত্ত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না। ছিল অনেক বেশি গতিশীল এবং উন্মুক্ত। তাই চরিত্র নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলায় তাঁর আপাত অ্যাবসার্ডধর্মী চরিত্র আরেফ আলী কিংবা মুহাম্মদ মুস্তফা অথবা প্রবল অস্তিত্ব-সংশ্লেষী চরিত্র মজিদ কাউকেই শেষপর্যন্ত আরোপিত ও কৃত্রিম মনে হয় না। বরং, সমসাময়িক বাংলা উপন্যাসের অনেক চরিত্র অপেক্ষা তাদের বেশ যুক্তিযুক্ত ও জীবনবোধসম্পন্ন মনে হয়। আর উপন্যাসমাত্রই কোনো না কোনোভাবে যেহেতু সেটা লেখকের জীবনদর্শনের প্রতিফলক, তাই মজিদ-আরেফ আলী-মুহাম্মদ মুস্তফার বাহ্যিক গঠনে তত্ত্বগন্ধী আবহ পাওয়া গেলেও, তাদের চরিত্রগুলো মূলত লেখকের সমাজ ও রাজনীতি সচেতন মনন দ্বারা উৎসারিত কৌশলী সৃষ্টি।

৭

রাজনৈতিক অভিমুখ সন্ধানের প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিক সময়বৃত্তের পরিধি ধরে আগালে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, বাঙালি মুসলমানের অনিবার্য অথচ বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ এবং বিড়ম্বিত প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্তের ওপর ভর করে গড়ে উঠেছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রথম উপন্যাস *লালসালু*-র কাহিনি। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে দেশবিভাগের ক্ষতকে বুকে চেপে এই উপন্যাস রচনা করেন তিনি। উপন্যাসের পটভূমিতে গারো পাহাড়ের নিঃসঙ্গতার বুনো গন্ধবাহী মজিদের আত্মপ্রকাশ এবং শূন্যতা থেকে সুপ্রতিষ্ঠা লাভের পুরো প্রক্রিয়া তাই গূঢ়ার্থবাহী ও সাংকেতিক:

> ক্রমে ক্রমে মজিদের ঘরবাড়ি উঠলো। বাহির ঘর, অন্দর ঘর, গোয়াল ঘর, আওলা-ঘর। জমি হলো, গৃহস্থালী হলো। নিরাকপড়া শ্রাবণের সেই হাওয়া-শূন্য স্তব্ধ দিনে তার জীবনের যে নোতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিলো, মাছের পিঠের মত সালু কাপড়ে আবৃত নশ্বর জীবনের প্রতীকটির পাশে সে জীবন পদে পদে এগিয়ে চললো। হয়তো সামনের দিকে, হয়তো কোথাও নয়। সে-কথা ভেবে দেখবার লোক সে নয়।[২৭]

মতিগঞ্জের সড়ক ধরে এসে মহব্বতনগর গ্রামে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কবরকে লাল কাপড়ে ঢেকে মোদাচ্ছের পীরের মাজারে পরিণত করে মজিদ। গ্রামটিতে তার বসবাস শুরুই হয় মিথ্যা ও ছলনার ওপর ভর করে। তবে মজিদের পূর্বের জীবন অনুমানে, যদি তাকে বাস্তুচ্যুত মানুষ বিবেচনা করা হয়, তাহলে তার ধর্মব্যবসাজনিত কর্মকাণ্ডের পেছনের প্রভাবককে অযৌক্তিক মনে হয় না। কারণ একজন মজিদ শুধু একক সত্তা নয়, একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের জনসমষ্টির একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধি। তার বাস্তবমুখী জীবনচৈতন্যের প্রাগ্রসরতায় দেশবিভাগকালীন বাংলাদেশের যেকোনো মুসলমানেরই অন্তর্লোক উন্মোচিত:

> মজিদের জমিজোত বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সম্মানও বাড়ে। গাঁয়ের মাতব্বর ওর কথা ছাড়া কথা কয় না; সলাপরামর্শ, আদেশ-উপদেশ, নছিহতের জন্যে তার কাছেই আসে, চিরনীরব সালুকাপড়ে আবৃত মাজারের মুখপাত্র হিসেবে

> তার কথা সাগ্রহে শোনে, খরা পড়লে তারই কাছে ছুটে আসে খতম পড়াবার জন্যে। খোদা রিজিক দেনেওয়ালা এ-কথা তারা আজ বোঝে। মজিদও আত্মবিশ্বাস পায়।[২৮]

ধর্মসম্প্রদায়গত আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নে তখন মানুষের প্রধান প্রয়োজনই ছিল আত্মবিশ্বাস। তাই সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মকেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মজিদ তার চরিত্রের নেতিবাচক রূপের বিন্যাসকেই সুসজ্জিত করে তোলে। অস্তিত্ব-সন্ধানী যেকোনো মানুষই ঐ দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ সময়ে দাঁড়িয়ে হয়তো মজিদই হয়ে উঠত বহির্জগতে কিংবা অন্তর্লোকে। অতএব, ধর্ম ও শোষণ ক্ষমতার চিরায়ত মেলবন্ধনে; মহব্বতনগর গ্রামেও মজিদ ও খালেক ব্যাপারীর সংঘবদ্ধ শক্তির সৃষ্টি হবে, এটি অপ্রত্যাশিত নয়।

ঔপন্যাসিক সমাজের ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি প্রকাশে ছিলেন নির্ভীক ও উচ্চকণ্ঠ। তাই মজিদের উত্থান যেমন তিনি চিহ্নিত করেছেন নির্মম সত্যে, পুরো উপন্যাসে তার পদস্খলন ও পতনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন যথার্থ বর্ণনায়। অবৈধ পন্থায় অর্জিত কোনো স্থানের ভিত্তি নড়বড়ে হয় সর্বদাই। সেজন্য মজিদকেও একটা অজানা শঙ্কায় সন্ত্রস্ত হতে দেখা গেছে মাঝেমধ্যেই। যখনই কোনো বিরোধী শক্তির আভাস পেয়েছে সে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী সেই শক্তিকে নির্মূল করতে মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা গেছে তাকে। তাই আওয়ালপুরের পীরের উদ্ভব মেনে নিতে পারেনি সে। মহব্বতনগর গ্রামবাসীর কাছে স্থান হারানোর আশঙ্কায়, তাদেরকে সেই পীরের প্রভাব মুক্ত করতে নিজের সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করে মজিদ:

> মতিগঞ্জের সড়কে উঠে ফিরতিমুখো পথ ধরে মজিদ একবার পেছনে ফিরে তাকিয়ে থুথু ফেলে, তওবা কেটে, নিঃশ্বাসের নীচে শয়তানকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো, তারপর দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগলো। সঙ্গের লোকেরা কিন্তু কিছু বললে না। তারা যদিও মজিদকে অনুসরণ করে বাড়ি ফিরে চলেছে কিন্তু মন তাদের দোটানার দ্বন্দ্বে দোল খায়। চোখে তাদের এখনো অশ্রুর শুষ্ক রেখা।[২৯]

জীবন সবসময় সরলরেখায় চলে না। মজিদের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রভুত্বের জাল কৌশলে বিস্তার করে তার উন্মুলিত জীবনের গতি সে সচল রাখতে পেরেছে। তবে আপাত শক্তিশালী যেকোনো বিপরীত পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ালে বারবারই তাকে আত্মঘোষণার মাধ্যমে নিজ অস্তিত্বের জানান দিতে হয়েছে। তাই আউয়ালপুরের পীরের জনসভা থেকে নিজের গ্রামের লোকদের ফিরিয়ে আনতে তাকে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছে। অন্যদিকে আক্কাসের ইংরেজি শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে তার ধর্মব্যবসার সংঘাতের ঘটনায়ও পুরোটাই গলাবাজি করে টিকে থাকতে হয়েছে তাকে:

> হাসির পর মজিদ গম্ভীর হয়ে ওঠে। তারপর বলে, আক্কাস মিঞা যে-দিনকালের কথা কইলো তা সত্য। দিনকাল বড়ই খারাপ। মাইনষের মতি-গতির ঠিক নাই, খোদার প্রতি মন নাই; তবু যাহোক আমি থাকনে লোকদের একটু চেতনা হইছে–।[৩০]

মজিদের আত্মবিজ্ঞাপনেই তার দুর্বলতা প্রমাণিত। মানুষের জীবনে সুখ, ক্ষমতা সচ্ছলতার প্রগল্‌ভতার পাশাপাশি পরাভবের শঙ্কাও ক্রিয়াশীল থাকে সমানতলে। তাই এত প্রতিপত্তি সত্ত্বেও মজিদ দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলার বিদ্রোহের মুখে নাস্তানাবুদ হয়েছে বারবার। এ যেন বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর প্রতি শোষিত জনগণের বিপ্লবের বহিঃপ্রকাশ:

> সে ল্যাট মেরে বসেই থাকে। হঠাৎ তার মনে বিদ্রোহ জেগেছে। সে উঠবেও না, কিছু বলবেও না। কোন কথাই সে বলবে না। নামাজ যে পড়েছে, এ কথাও না।
> ক্ষণকালের জন্য মজিদ বুঝতে পারে না কী করবে। মহব্বতনগরে তার দীর্ঘ রাজত্বকালে আপন হোক পর হোক কেউ তার হুকুম এমনভাবে অমান্য করেনি কোনো-দিন। আজ তার ঘরের এক রত্তি বউ–যাকে সে সেদিনমাত্র ঘরে এনেছে একটু নেশার ঝোঁক জেগেছিলো বলে–সে কিনা তার কথায় কান না দিয়ে অমন নির্বিকারভাবে বসে আছে।[৩১]

নেশার এই ঝোঁক যে মজিদের কেবল জমিলার প্রতিই জেগেছিল, তা নয়। হাসুনির মা, আমেনা বিবি এমনকি প্রথম স্ত্রী রহীমার প্রতিও তার দৃষ্টিতে মাঝেমধ্যে যে লোভাতুর আবেশ দেখা গিয়েছিল, এটা তার চারিত্রিক স্খলনের আরেকটা নজির। অর্থাৎ, নায়কত্বের বীরপ্রজ্ঞা তার মধ্যে যেমন ছিল না, প্রতি-নায়কের দৃপ্ত মনোভাবও তার অভীষ্ট নয়। সে কেবল নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের প্রাবল্যে গড়ে ওঠা একজন অস্তিত্ব-সংহারী মানুষের প্রতিরূপ। যাই হোক, মজিদের বিরুদ্ধে জমিলার উপরি-উক্ত প্রতীকী বিদ্রোহে উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে যখন তার প্রথম স্ত্রী রহীমাও যোগ দেয়, বাহিরের কাঠিন্য সত্ত্বেও তার অন্তরাত্মার প্রকম্পন সে লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়:

> মজিদ আবার ওর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বিস্মিত কণ্ঠে বলে,
> –কী হইলো তোমার বিবি?
> রহীমা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারপর স্বামীর পানে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় বলে,
> –ধান দিয়া কী হইবো মানুষের জান যদি না থাকে? আপনে ওরে নিয়া আসেন ভিতরে।[৩২]

একই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পারিবারিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ক্রমাগত আত্মশ্লাঘায় ভুগতে থাকা মজিদের ধর্মতান্ত্রিকতায় ছেদ পড়তে দেখা যায়। নিরস্তিত্ব বোধ তাকে রূপান্তরিত করে জীবনযুদ্ধের পরাজিত সৈনিকে। উপন্যাসের শুরুতে আগন্তুক মজিদ উপন্যাসের শেষেও অন্য চরিত্রগুলোর মানবীয় উজ্জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শেকড়হীনতা উপলব্ধি করতে বাধ্য হয়:

> মজিদ অদূরে বিমূঢ় হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে কেয়ামত হবে। মুহূর্তের মধ্যে মজিদের ভেতরেও কী যেন একটা ওলট-পালট হয়ে যাবার উপক্রম করে, একটা বিচিত্র জীবন আদিগন্ত উন্মুক্ত হয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পায় তার চোখের সামনে, আর একটা সত্যের সীমানায় পৌঁছে জন্মবেদনার তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করে মনে-মনে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাল খেয়ে সে সামলে নেয় নিজেকে।[৩৩]

আত্মনিগ্রহের শেষপর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া মজিদ চরিত্রটির নায়ক বা প্রতি-নায়ক কোনোটি হওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যায়নি কখনো। বরং গ্রামীণ পটভূমিতে নির্মিত এই চরিত্রটি ব্যক্তি-অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে যা যা করেছে, কার্যকারণসূত্রে মুদ্রার অপরপিঠ বিবেচনায় তার সবই সমাজের বস্তুগত সত্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

৮

বিষয়চিন্তার প্রাতিস্বিকতায় রচিত *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) উপন্যাসটি তৎকালীন রাজনীতির রক্তার্দ্র অধ্যায়ের সাক্ষ্যবহ। দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, ধর্মভিত্তিক অপরাজনীতি, রাষ্ট্রযন্ত্রের হঠকারিতাসহ নানা বৈষম্য ও লাঞ্ছনার একপর্যায়ে ১৯৪৭ সালে যখন দেশভাগ হলো, বাঙালি মুসলমানরা তখন জাতিগত জাগরণের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু ১৯৪৮ সাল

আসতে না আসতেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়, তারা বুঝতে পারে এক ঔপনিবেশিক শাসনের যন্ত্রণার ক্ষত না শুকানোর আগেই তারা পাকিস্তানি শাসকদের নব্য-ঔপনিবেশিক কূটজালে জড়িয়ে পড়েছে। সেটা অনুভব করেই মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের দাবিতে, স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবিতে তাদের প্রতিবাদ ও সংগ্রাম জোরালো হয়ে ওঠে। আর ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন এসবই হলো পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ বিদ্রোহীসত্তার আত্মপ্রকাশের সূচনা।

পূর্ববাংলার মানুষের নানারূপ বিপ্লবে ও জাগরণে রাষ্ট্রকাঠামোর যখন টালটামাল অবস্থা, তখন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণে মানবমুখী লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ নৈতিক দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে এমন এক উপন্যাসের জন্ম দিলেন, যেখানে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও সেটির বেদনা সামলে নিয়ে তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর যে আত্মপ্রত্যয়, সেই সামষ্টিক অভিজ্ঞানকে ব্যক্তিক আবহে ফুটিয়ে তোলার প্রোজ্জ্বল প্রয়াস দেখা যায়। উপন্যাসটিতে আত্মখনন ও সত্যসন্ধানের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ব্যক্তিক বলয়ে নির্মিত আরেফ আলী চরিত্রটি হয়ে উঠেছিল জনসমাজের অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্যের সামূহিক প্রকাশ:

> তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘরাভিমুখে হাঁটতে শুরু করে। সবুজ আলোয়ানে আবৃত তার শীর্ণ শরীর দীর্ঘ মনে হয়, পদক্ষেপে অসীম দুর্বলতার আভাস দেখা গেলেও তাতে সঙ্কোচ-দ্বিধা নাই। তার অনভিজ্ঞ মনে নিদারুণ আঘাতের ফলে যে-প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিলো, সে বিক্ষুব্ধতা বিদূরিত হয়েছে।
>
> কোনদিকে না তাকিয়েই সে দ্রুতপদে হাঁটতে থাকে। সে আর ভাবে না। ভাবতে চেষ্টা করলেও তার ভাবনা ধরবার কিছু পায় না। বৃহৎ গহ্বরে ধরবার কিছু নাই।[৩৪]

তৎকালীন শাসনব্যবস্থার রীতিপ্রকৃতি এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তুলনা করলে লেখকের সুতীব্র রাজনৈতিক বোধের পরিচয় মেলে। বাঁশঝাড়ে এক মাঝির নিঃসন্তান স্ত্রীর অপঘাতে মৃত্যু; একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের পথচলার শুরুতেই নানাবিধ শোষণ ও বিশ্বাসঘাতকতায় মুখ থুবড়ে পড়ার সঙ্গে তুলনীয়। বহির্জগতে অসংখ্য আরেফ আলীরূপী জনগণ যখন বোধিচিত্তের উত্তরণে ব্যস্ত, উপন্যাসের আরেফ আলীও তখন ভীতিশিহরিত পদক্ষেপে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় লিপ্ত রয়েছে আত্মবিশ্লেষণের প্রারম্ভে:

> তারপর হঠাৎ যুবক শিক্ষকের মাথায় বিপুলবেগে একটা অন্ধ ঝড় ওঠে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে বুঝতে পারে না কী করবে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটতে শুরু করে। তার সমস্ত চিন্তাধারা যেন হঠাৎ বিচিত্র গোলকধাঁধায় ঢুকেছে এবং সে-গোলকধাঁধা মুক্তি পাবার জন্যে সে দৌড়াতে শুরু করে। কিন্তু কোথাও মুক্তিপথের নির্দেশ দেখতে পায় না। সে দৌড়াতেই থাকে। যুবক শিক্ষক জ্যান্ত মুরগি-মুখে হালকা তামাটে রঙের শেয়াল দেখেছে, বুনো বেড়ালের রক্তাক্ত মুখ দেখেছে, কিন্তু কখনো বিজন রাতে বাঁশঝাড়ের মধ্যে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখে নাই। হত্যাকারী দেখে নাই সে ছুটতেই থাকে।[৩৫]

কোনো নায়কোচিত বীরত্ব কিংবা প্রতি-নায়কদের মতো আত্মভেদী অভিজ্ঞতা নেই বলেই যুবতী নারীর হত্যাকারী হিসেবে বড়বাড়ির 'দরবেশ'খ্যাত কাদেরকে শনাক্ত করার সিদ্ধান্তে আসতে আরেফ আলীকে যথেষ্ট বেগ পোহাতে হয় প্রথম প্রথম। পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণ যেমন নতুন কিছুর প্রত্যাশায় ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনে সায় দিয়েছিল প্রথম পর্যায়ে, বিষয়টি যেন অনেকটা সেরকমই। এই ভূখণ্ডের মানুষ পাকিস্তানিদের ওপর ভরসা রেখেছিল আর আরেফ আলী ভরসা রাখতে চেয়েছিল

কাদেরের ওপর। যদিও ব্যক্তিলব্ধ জ্ঞানে হত্যাকাণ্ডের পেছনে ক্রিয়াশীল প্রভাবকগুলো সম্পর্কে সে প্রথমেই ধারণা করেছিল। পাশাপাশি বিক্ষিপ্ত মনে একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে সে কাদেরকেই হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করতে চেয়েছে শুরু থেকে, তবুও সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আত্মসাংঘর্ষিক প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হয়ে তাকে দেখা গেছে চেতন-অবচেতনের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায়:

> যুবক শিক্ষকের মনে কাদেরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি আরো গাঢ় হয়। একটু অবাক হয়ে সে আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। সে যেন স্বচ্ছ, শঙ্কাভীতিশূন্যদৃষ্টিতে যুবতী নারীর দিকে তাকাতে পারছে। শুধু তাই নয়। যাকে সে জীবিতকালে কখনো দেখে নাই, মৃত্যুর পরও যার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে নাই, তারই প্রতি কেমন একটু মমতাও বোধ করতে শুরু করেছে। অবশ্য সে বোঝে, কাদেরের মনের মমতার তুলনায় তা নগণ্য অংশ মাত্র। তবু তা দুজনের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে যেন।[৩৬]

দেশভাগের যন্ত্রণা বহন করা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ পাকিস্তানি শাসকদের নয়া উপনিবেশ বিস্তারের কুচক্র ও চতুরতা আত্মস্থ করতে পারেনি সহজে। তাই তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র আরেফ আলীকেও কাদেরের প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস হারানোর আগে নিজের সঙ্গে নানারূপ বোঝাপড়া করতে দেখা যায়। এই বোঝাবুঝির অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্রমাগত আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে আত্ম-মীমাংসার বিচিত্র পথে তার উদ্‌ভ্রান্ত পদচারণায় কখনও কখনও তাকে অ্যাবসার্ডিটির চূড়ান্ত সীমায় আরোহিত অবস্থায় দেখা গিয়েছে :

> এবার যুবক শিক্ষক শুধু যে দেহটি নদীতে ফেলার সিদ্ধান্তের কারণ বোঝে তা নয়, কাদের কেন তার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলো সে-কথাও সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে। একজন মানুষের সাহায্যের তার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিলো বইকি। যুবতী নারী মৃত হলেও তার দেহটি তার অতি প্রিয়। একাকী তা বহন করার চেষ্টা করলে তার অযত্ন-অসম্মান হতো, দেহটি টানা-হ্যাঁচড়া করতে হতো, প্রতি মুহূর্তে এ-কথাও স্মরণ হতো যে সে আর জীবিত নাই। কাদেরকে সাহায্য করার সময় যুবক শিক্ষক যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো। কিন্তু এখন ঘোর অন্ধকার থেকে কাদেরের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শুনতে পায়। বারে বারে সে কি তাকে সাবধান হতে বলে নাই? এত সাবধানতার অর্থ কি এই নয় যে, যুবতী নারীর মৃতদেহেও একটু আঁচড় লাগবে তা তার সহ্য হয় নাই?[৩৭]

এই আত্মতত্ত্বজ্ঞ হয়ে ওঠার বিকল্প পথটিতে হাঁটতে শুরু করার এক পর্যায়ে আরেফ আলীর চরিত্রে প্রতি-নায়ক হয়ে ওঠার একটা সূক্ষ্ম আভাস পাওয়া যায়। তবে যেহেতু লেখকের স্বপ্রণোদিত উদ্দেশ্য ছিল নায়কহীন রচনার সৃষ্টি, সেহেতু আরেফ আলী চরিত্রকে এক ঝটকায় সে মৃত্তিকা-সংলগ্ন মানুষের কাতারে এনে দাঁড় করায়, যাদের জীবনে তত্ত্ব-উপাত্ত তৈরির মতো কোনো নায়কত্ব থাকে না। বরং যাদের কার্যকলাপের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, সমাজসত্যের সমান্তরালে তাদের প্রতিস্থাপন করে। সুতরাং, কাদেরের পক্ষে সৃষ্ট অদ্ভুত মনোবৃত্তির পালা সাঙ্গ করে সাম্য-প্রতিসাম্যের জটিল ক্রিয়ায় অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগা অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো আরেফ আলী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে একটা সময়:

> বাড়ি ফেরবার পথে যুবক শিক্ষকের তৃপ্ত-মনে হঠাৎ অপ্রীতিকর একটি সন্দেহের ছায়া উপস্থিত হয়। যুবতী নারীর হত্যাকারী কে, সে নিজেই নয়? সে যদি কাদেরকে অনুসরণ না করতো, অপ্রত্যাশিতভাবে এবং অকারণে বাঁশঝাড়ের সামনে উপস্থিত না হতো, তবে দুর্ঘটনাটি ঘটতো না।[৩৮]

এই প্রতিক্রিয়ারও রাজনৈতিক অভিমুখ বিশ্লেষণে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদ গর্জে ওঠার প্রারম্ভে বাঙালিদের এরকমই অনতিক্রম্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। বাঙালি জাতিসত্তার প্রবল আত্মপ্রকাশকে সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্যের বিচারে অন্তর-বাহিরের

সমগ্রতাসহ যাচাই করলে আরেফ আলীর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গতিপথ বোঝা সহজতর হয়:

> যুবক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ না আনলেও কথাটি প্রকাশ করার পর তাকে বড়বাড়ির আশ্রয় এবং ইস্কুলের শিক্ষকতার চাকুরিটি ছাড়তে হবে। তারপর এখানে থাকতে তার বিবেকে বাধবে। তখন সে কোথায় যাবে? কোথায়ই-বা এমন লাভজনক চাকুরি বা দাদাসাহেবের মত এমন স্নেহ-দয়াশীল অভিভাবক পাবে?
>
> তবু কথাটা প্রকাশ না করে তার উপায় নাই। উপায় থাকলে সে বলতো না। বাঁশঝাড়ে একটি নারী অর্থহীনভাবে জীবন দিয়েছে। তার বিশ্বাস, মানুষের জীবন এত মূল্যহীন নয়। না, সত্যিই তার উপায় নাই।[৩৯]

স্কুলে শিক্ষকদের বিশ্রামঘরে মাঝির মৃত স্ত্রীকে কেন্দ্র করে চলতে থাকা কানাঘুষা, আরেফ আলীর মুখ বন্ধ রাখতে দাদাসাহেবের ক্ষমতার কৌশলী প্রদর্শন ইত্যাদি ঘটনায় বাঙালিদের একাংশের চরিত্রের অতি স্বাভাবিক কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেসব বিশ্লেষণে কোনো তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। পাশাপাশি জীবন-আশ্রয়ী ও বাস্তব-মুখী লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নির্মিত আরেফ আলী চরিত্রটি সমগ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, কোনো সমুদ্রজয়ী বীর বা অসীম সাহসী যোদ্ধা নয়। তাই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাকে মানসলোকের দোলাচলে দোদুল্যমান হতে হয়েছে। তবে:

> তার তৃপ্তির কারণ এই যে, মনে-মনে যে-সব সম্ভাবনা সে দেখেছিলো, তা সত্যে পরিণত হয়ে তার সিদ্ধান্তকে অর্থপূর্ণ করেছে- কথাটা অত্যন্ত বড় মনে হয় তার কাছে। তার মনে যে তুমুল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো, সে-দ্বন্দ্বের ভিত্তি কাল্পনিক ভয় নয়। তাছাড়া, সে-সংগ্রাম পরের বিরুদ্ধে মনে হলেও আসলে নিজেরই বিরুদ্ধে ছিলো, সে-সংগ্রামে সে জয়লাভ করেছে।[৪০]

দেখা যায়, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষপর্যন্ত সে কাদেরের অপরাধের দায়ভার গ্রহণ করেছে, কারাবরণের শঙ্কা উপেক্ষা করেও দাঁড়িয়েছে আইন ও বিচারব্যবস্থার মুখোমুখি। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে যে আত্মশক্তির সে উদ্বোধন করেছে, তাকে সমগ্র জাতিসত্তার কল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত সামষ্টিক দৃষ্টি দিয়েও ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সুতরাং, লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ কল্যাণকামী চিন্তার বাস্তবায়নে নায়কোচিত কৃত্রিম কোনো চরিত্র নয় বরং নায়কহীন প্রেক্ষাপটে একটি জাতির সর্বহিতার্থক আত্মিক উন্নতির দিকে সচেতন পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই উপন্যাসটি রচনা করেছেন, বলা যায়।

৯

নায়কহীন অভিযাত্রায় ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসসমূহে প্রকৃষ্ট সংযোজন *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৮)। যেখানে আপাতদৃষ্টি দিয়ে দেখলে নায়ক এমনকি প্রতি-নায়ক তো দূরের কথা, কোনো একক চরিত্রের প্রাধান্যও প্রকট হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসটির পেছনে ক্রীড়নক ছিল উত্তাল ষাটের দশক। সেই ধারায় মুক্তিপ্রত্যাশী জনসমষ্টির বিস্তৃত সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসটি। বাকাল নদীর বুক থেকে ভেসে আসা ইঙ্গিতধর্মী কান্নার মাঝে কোনো অলৌকিকতা নেই, কুমুরডাঙ্গা শহরের অধিবাসীরাও রূপকথার দৈত্যের হাতে বন্দি নয়, আবার মুহাম্মদ মুস্তফার মাঝেও নেই কোনো বীরসূচক বিলাসিতার লেশমাত্র, যা দ্বারা কুমুরডাঙ্গার জনগণের জীবনে সে বড়োসড়ো পরিবর্তন আনতে চেয়েছে । বরং অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনের অধিকারী সে:

> বলতে গেলে, এ-পর্যন্ত তার জীবনটা একটি গভীর নীরবতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। অনেক ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কোন মত থাকেও না। জীবনসমুদ্র পার হতে হলে মুষ্টিমেয় কয়েকটি সহজবোধ্য বিশ্বাসই কি যথেষ্ট নয়?[৪১]

তবে উপন্যাসের অন্তর্লোকে পরিব্যাপ্ত পরিসর আপাতদৃষ্টিতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের সমষ্টিগত আত্মমুক্তির পথ অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর সমাজ-অন্তর্গত ব্যক্তিক মনোজগতের উন্মোচনও পরোক্ষভাবে ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক দর্শনের পরিচায়ক। তাই মুহাম্মদ মুস্তফাকেও মজিদ কিংবা আরেফ আলীর মতো জীবনপ্রবাহের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ারত অবস্থাতেই দেখা গেছে:

> পরদিন সকালে বাড়ির পশ্চাতে শ্যাওলা-ঢাকা লতাপাতা-উদ্ভিদে সমাকীর্ণ ডোবার মত পুকুরের পাড়ে যখন হাতমুখ ধোবার জন্যে উপস্থিত হয় তখন সেখানে সে কিছু সন্ধান করে না; সেখানে যা ঘটে গিয়েছে তার কোন চিহ্ন থাকার কথা নয়: একটি জীবন যে-ভাবেই শেষ হোক না কেন সে-জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে।[৪২]

জীবনটাকে সরলভাবে চিন্তা করতে চেয়েছিল মুহাম্মদ মুস্তফা। বিশেষ করে বিভ্রান্ত শৈশব ও কৈশোরে পিতা খেদমতুল্লার অস্বাভাবিক এবং লক্ষ্যহীন জীবন তাকে জীবনঘনিষ্ঠ করে গড়ে ওঠার তাগিদ দেয়। বিশেষত বাবার মৃত্যু, তার চেতনালোকে আমূল পরিবর্তন সাধন করে:

> ঘোর পাপিষ্ঠ মানুষেরও জীবনে উদ্দেশ্য থাকে; লোভ হিংসা নিচতা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইলেও সে উদ্দেশ্যহীন নয়। উদ্দেশ্যহীন মানুষ আর মানুষ নয়, সে অমানুষ। তার বাপ খেদমতউল্লা কী অমানুষ ছিলো?[৪৩]

নানাবিধ বিপত্তি ও ভয়-ভীতির সংশ্লেষে কেটেছে মুহাম্মদ মুস্তফার বাল্যজীবন। তাই জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত পাড়ি দিয়ে এসে, পিতার নেতিবাচক জীবনধারার সম্পূর্ণ বিপরীতগামী হয়ে নিজেকে গড়ে তুলে সে যখন নিজেকে জীবনপথের অভিজ্ঞ পরিব্রাজক ভাবতে শুরু করেছিল, তখনই হঠাৎ করে ফুফাতো বোন খোদেজার মৃত্যুসংবাদ জীবনের অর্থহীনতা সম্পর্কে তাকে নতুন করে ভাবিয়ে তোলে। যদিও এটিকে প্রথমাবস্থায় স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে নিতে চায় তার বহুচর্চিত সাদামাটা মন, কিন্তু সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বহির্জগতের নানামুখী প্রভাবক:

> বাড়ির লোকেদের সরল, বিমর্ষ, কাল্পনিক কাহিনীতে আত্মমগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে এ-কথাও বুঝতে পারে যে, মেয়েটি তার জন্যে আত্মহত্যা করেছে বিশ্বাস করলেও তার বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই, কোন ক্রোধও নেই, যেন দোষ তার নয় অন্য কারো, আসল অপরাধী দৃশ্যগত জীবন-মঞ্চের অন্তরালেই কোথাও লুকিয়ে। হয়তো এ-জন্যে সে শেষপর্যন্ত ক্ষীণতম প্রতিবাদ জানাতেও সক্ষম হয় না। তার ক্রোধ পড়ে, সে শ্রান্তও বোধ করে।[৪৪]

এই ক্রোধ ও শ্রান্তি তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়। সে স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে দেখে, তার বাবা খোদেজার সঙ্গে তার বিয়ের বিষয়ে তার ফুফু অর্থাৎ খোদেজার মাকে যে কথা দিয়েছিল, সেটি তার বাবার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মতোই অন্তঃসারশূন্য। ঐ মানস পরিভ্রমণের ফলে পুরনো দিনগুলোতে ব্যক্তিগত জীবনের কশাঘাতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তোলার স্মৃতি-অনুষঙ্গী চিন্তা তাকে আবারও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে:

> হয়তো কি করে এই কথা বুঝে সে স্থির করে, নিজের সততা সচ্চরিত্রতার সাহায্যে বাপের কলঙ্ক দুর্নাম মুছে ফেলবে, নিজের নিরীহতা সজ্জনতার দ্বারা তার দুর্বৃত্ত চরিত্রের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দেবে: সন্তানের সুচরিত্র পিতার দুশ্চরিত্র সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলবে একদিন। হয়তো এই জন্যেই তার চরিত্রে এমন একটি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিলো।[৪৫]

তবে পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ মানুষদের মতোই আত্মগঠনের ক্রমাগত প্রয়াস সিসিফাসের শ্রমের মতো পণ্ডশ্রমে পরিণত হয় তার ক্ষেত্রেও। কুমুরডাঙ্গা শহরের ছোট হাকিমের চাকরি, আশরাফ হোসেন চৌধুরীর মেয়েকে বিয়ে করে একটা সাদামাটা জীবনের স্বপ্ন, সবই হুমকির মুখে এসে দাঁড়ায় তার অন্তর্লোকের অভিঘাতে। নিজের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধে লিপ্ত হয় সে। আর আত্মবিচারের এক পর্যায়ে মুহাম্মদ মুস্তফার অবস্থাও হয়ে ওঠে আরেফ আলীর মতো। চেতনার বিক্ষিপ্ত পরিব্রাজনে, একটা সময়ে এসে খোদেজার মৃত্যুর জন্য সেও বাকিদের মতোই নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করে:

> সহসা মুহাম্মদ মুস্তফার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, খোদেজা একটি প্রতিহিংসা-পরায়ণ আত্মায় পরিণত হয়েছে যে-আত্মা সারাজীবন তাকে পদে-পদে অনুসরণ করবে, অদৃশ্যভাবে, ছায়ার মধ্যে মিশে থেকে, হয়তো-বা তাকে এক সময়ে ধ্বংসও করবে। সেদিন রাতে সে যখন তন্দ্রাহীন চোখে বারান্দায় বসেছিলো তখন খোদেজারই উপস্থিতি অনুভব করেছিলো। ভয়টাও তখন জেগেছিলো–এমন ভয় যা মানুষের চোখের সামনে থেকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়।[৪৬]

আগেও বলা হয়েছে, মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনের একটা বড়ো অংশ অতিবাহিত হয়েছে নানারূপ আশঙ্কা, ভীতি ও কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে। অপরিসীম শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টায় সে এই প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পেরেছিল। সুশিক্ষা লাভ, সরকারি চাকরিতে যোগদান, সমাজে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে চাওয়া–এসবের মধ্যে তার স্বাভাবিক জীবনপ্রত্যাশী প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে এত পরিশ্রম সত্ত্বেও খোদেজার মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনাক্রম তাকে আর কখনোই স্বাভাবিক জীবনস্রোতে গা ভাসাতে দেয়নি। আত্ম-উন্মোচনের পথ সন্ধানে বারবার ব্যর্থ হতে থাকায়, নিজের সঙ্গে তুমুল অন্তর্দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে সে আত্মহননের মাধ্যমে আত্মবিনাশকেই মুক্তির সহজতর পথ মনে করে। কথকের ভাষায়:

> যখন বাড়ির পশ্চাতে উপস্থিত হই তখন দেখতে পাই, যে-তেঁতুলগাছের তলে বাল্যবয়সে একটি অদৃশ্য সীমারেখা পেরিয়ে গিয়েছিলো সে-গাছ থেকে মুহাম্মদ মুস্তফার নিষ্প্রাণ দেহ ঝুলছে, চোখ খোলা। সে-চোখ শ্যাওলা-আবৃত ডোবার মত ক্ষুদ্র পুকুরে কী যেন সন্ধান করছে।[৪৭]

জীবনের অর্থসন্ধানে বিচলিত হতে দেখা যায়নি মুহাম্মদ মুস্তফাকে। অর্থহীন জীবনও তাকে ভাবিয়ে তোলেনি তেমন। খোদেজার মৃত্যুপরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ঘূর্ণাবর্তে পথ না হারালেও বোধহয় তার জীবন নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করার মতো বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে এমন সাদামাটা জীবন নায়কোচিত হয়ে উঠবে না, এটাই স্বাভাবিক। আবার লেখক যে, একজনকে প্রাধান্য দিয়ে উপন্যাসটি রচনা করেননি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় একেবারে শেষের দিকের বর্ণনায়। যখন বলা হয়েছে নদী তার নিজের জন্য কাঁদে না, কাঁদে সকলের জন্য। উপন্যাসের পটভূমি অনুযায়ী এই 'সকলে'র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়তো মুহাম্মদ মুস্তফা এবং কুমুরডাঙ্গার সমস্ত অধিবাসী। কিন্তু ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞান পর্যালোচনা করে বলা যায়, এখানে নদীর কান্নার সঙ্গে কালের রিক্ততা, শূন্যতা এবং হাহাকার তুলনীয়। সময়ের অস্থির এই কান্না যেন একটি স্বাধীনতাকামী ভূখণ্ডের সংগ্রামরত সকল মানুষের জন্য। যাদের আত্মত্যাগ ও রক্তস্রোতে আর্দ্র হয়ে উঠেছে সমকাল। সুতরাং, এই উপন্যাসে নায়কোচিত কোনো বিশেষত্ব লক্ষ

করা যায় না। নির্বিশেষে উপন্যাসের প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি স্থান এবং ঘটনা কালের সাক্ষী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০

পরিশেষে বলা যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর উপন্যাসসমূহের চরিত্র নির্মাণে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর ওপর এককভাবে নির্ভর না করলেও, উপন্যাসগুলোর প্রত্যেকটিতেই একটি সুনির্দিষ্ট বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মানবতাবাদী কল্যাণচিন্তা দ্বারা উদ্দীপিত এই বোধের মূলসুর ছিল নিজ ভূখণ্ডের জনসমষ্টির যাপিত জীবনের রূপরেখা নির্মাণ:

> ওয়ালীউল্লাহ্‌র সৃষ্টিশীলতার কেন্দ্রভূমিতে সর্বদাই বসবাস করে এক সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি। মৃত্যু, ধ্বংস, হতাশা, নৈরাশ্য প্রভৃতির বাস্তবতা তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত হলেও পরিণামে এসব আখ্যান এক গভীর মানবিক বোধে উন্নীত হয়। এর কারণ, তাঁর ব্যক্তিতৈন্যের মর্মমূলেই অবস্থান করে এক সার্থক ও কল্যাণকর জীবনানুভূতি যা তাঁর সৃষ্টিকে আশাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করে।[৪৮]

প্রকৃতপক্ষে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনার গভীরে সর্বদাই প্রোথিত ছিল স্বদেশ-সময়-সমাজগত এক দীপ্ত রাজনৈতিক প্রণোদনা। ফলে তাঁর উপন্যাসগুলোর বহিরাবণে বৈচিত্র্যময় পরিপ্রেক্ষিতের দেখা মিললেও, সবগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একই সূত্রে গাঁথা। তাই *লালসালু*, *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসত্রয়ের প্রেক্ষাপটে ভিন্নতা থাকলেও এগুলোর মূল উপজীব্য স্বল্প-পরিসরের কোনো বিষয় বা একজন নির্দিষ্ট মানুষের জীবনকাহিনিতে আলোকপাত করা নয়। বরং একটা অখণ্ড সমগ্রতায়, সমাজবৃত্তের নির্মোহ নিরীক্ষণ এবং কিছু ঘটনার সংশ্লেষে ও চরিত্রের বিন্যাসে সেই পর্যবেক্ষণকে লিপিবদ্ধ করা। যেখানে কাহিনির গতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখতে মজিদ, আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনকে কেন্দ্রে রেখে পার্শ্বচরিত্র ও ঘটনাবলির মাধ্যমে আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত সামগ্রিক পরিধি অঙ্কন করতে হয়েছে।

যেহেতু শেষমেষ তাঁর উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হওয়া ছিল না, ছিল সামূহিক বিস্তার লাভ; সেহেতু আপাত দৃষ্টিতে মজিদ, আরেফ আলী ও মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তুললেও, তাদের তিনি সাহিত্যের চিরায়ত আধিপত্যবাদী নায়কচরিত্রের প্রত্ন-আদর্শে অধিষ্ঠিত করতে চাননি। তাই *লালসালু* উপন্যাসে মজিদ ও গ্রামবাসীর কূপমণ্ডূকতা ও রক্ষণশীল চিন্তার বিপরীতে তিনি প্রথমে জমিলা এবং পরবর্তীকালে রহীমার প্রতিবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন সমান গুরুত্ব দিয়ে। আবার *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসে কাদেরের প্রেমহীন শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সেই সূত্রে মাঝির বন্ধ্যা স্ত্রীকে হত্যার ঘটনার সমান্তরালে, সেটির বিরুদ্ধে আরেফ আলীর আত্মশক্তির জাগরণে, সঠিক বিচারের দাবি উপস্থাপনকে তৎকালীন রাষ্ট্রের শোষণ ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, জনসমষ্টির বিদ্রোহচেতনার সঙ্গে তুলনা করা যায়। সবশেষে, *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসে মুহাম্মদ মুস্তফার আত্মহনন যেমন মানবজাতির পরাভবের সঙ্গে তুলনীয়, ঠিক তেমনি হতাশাগ্রস্ত ও সংগ্রামশীল জীবনের অধিকারী সকিনা খাতুনের নদীর কান্না শোনা, বাকাল নদীতে চর পড়াসহ কুমুরডাঙ্গার মানুষের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার বিপরীতে স্টিমার কোম্পানি থেকে চাকরিচ্যুত

খতিব মিঞার কুমুরডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাওয়ার সিদ্ধান্তে মানুষের হার-না-মানা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, যেহেতু তাঁর সাহিত্যকর্মের অভীষ্ট শেষ অবধি মানুষের জয়গান গাওয়া; সেহেতু তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলোও সেই অভীপ্সা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় একক নায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে, হয়েছে নায়কহীন সমগ্রতায় নির্মিত।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আজিজুল হক, *বাংলা কথাসাহিত্যে মানবভাবনা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ১৪৩
২. গোপাল হালদার, *ইংরেজী সাহিত্যের রূপরেখা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৯৭
৩. দেবেশ রায়, *উপন্যাস নিয়ে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২২
৪. দেবেশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৫. দেবেশ রায়, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৮২
৬. দেবেশ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭
৭. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৩০২
৮. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ২৮
৯. সৈয়দ আবুল মকসুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য*, মনন প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৮
১০. সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২
১১. ভীষ্মদেব চৌধুরী, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস: একটি রাজনৈতিক ভূমিকা*, *নান্দীপাঠ*, সাজ্জাদ আরেফিন সম্পাদিত, ঢাকা, ২০১৪, সংখ্যা: ৬, পৃ. ৮৩
১২. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১১
১৩. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, *আমার স্বামী ওয়ালী*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৪৩
১৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *অগ্রন্থিত রচনা*, সাজ্জাদ শরিফ সম্পাদিত, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১০৮
১৫. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫
১৬. আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২
১৭. Richard Farnell, Lewis, *Greek Hero Cults and Ideas of Immortality*, Oxford University Press, London, 1921, p. 19
১৮. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৬০
১৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৭৩
২০. তানভীর মোকাম্মেল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪৭
২১. Kafka, Franz, *The Trial*, Translated by Mike Mitchell, Oxford University Press, New York, 2009, p. 5
২২. সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
২৩. Camus, Albert, *The Plague*, Translated by Stuart Gilbert, Penguin Books, London, 2010, p. 177-178

২৪. Camus, Albert, *The Outsider*, Translated by Sandra Smith, Penguin Books, London, 2013, P. 108
২৫. Dostoyevsky, Fyodor, *The Brothers Karamazov*, Translated by Constance Garnett, The Lowell Press, New York, 2009, p. 407
২৬. Sartre, Jean-Paul, *Being and Nothingness*, Translated by Hazel Estella Barnes, Routledge, London, 2003, p. 74
২৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রচনাবলী* ১, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯-৯০
৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৫
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৬
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৭
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫
৪৮. সৈয়দ আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্প: খাঁটি মানুষের সন্ধান

সুমনা আক্তার*

সারসংক্ষেপ

কমলকুমার মজুমদার বিংশ শতাব্দীর মনুষ্যত্বের সর্বাত্মক অপচয়ের মধ্যে খাঁটি মানুষের অনুসন্ধান করেছেন তাঁর সৃষ্ট গল্পে। বিশ্বযুদ্ধোত্তর উত্তাল পৃথিবী, রাজনৈতিক পালাবদলে সৃষ্ট শাসন ব্যবস্থার জটিলতা মানুষকে কতটা অসহায় করে তুলেছে কমলকুমার মজুমদার সৌন্দর্যবোধ ও নান্দনিক চেতনার নতুন অধিকরণে তা তুলে ধরেছেন। শুরুর দিকের গল্পগুলোতে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও আশাবাদী ও কল্পনাপ্রবণ হয়েছেন, ধীরে ধীরে তা পরিণত হয়েছে ক্রমক্ষয়িষ্ণু মানবতায় এবং মনুষ্যত্ব রক্ষার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। এই প্রচেষ্টা আপাতভাবে উদাসীন, নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক। তবে দুর্বোধ্য গদ্যভঙ্গিমা, অপরিচিত অন্বয়, বিষয়কে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণে উপস্থাপনের দ্বারা প্রত্যেকটি চরিত্রের মৌল স্বরূপকে উন্মোচন করার লক্ষ্যে তিনি সদা সচেতন ছিলেন শেষ অবধি। সরল মানুষের অন্তরাখ্যান নির্মাণে গল্প বলার মুন্সিয়ানাকে কাজে লাগিয়েছেন তিনি।

বাংলা সাহিত্যের দুরূহতম লেখক বলে মনে করা হয় কমলকুমার মজুমদারকে (১৯১০-১৯৭৯)। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভিন্নার্থক বীক্ষাকে তিনি সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিয়েছেন। সাধারণ ব্রাত্য শ্রেণির মানুষের জীবনের নিরালোক পরিসরকে পরম যত্নে নির্মাণই তাঁর সাহিত্যের মূল অন্বিষ্ট বলে মনে হয়। জীবনযুদ্ধে আপাত হেরে যাওয়া মানুষের কথা কিংবা টিকে থাকার একাগ্র চেষ্টায় ব্যগ্র মানুষের অন্তরের গোপন কথাকে শব্দরূপ দিয়েছেন তিনি। ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবতার মাপকাঠিতে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন। তিনি গল্পের পরিসরে প্রাকৃতজনের জীবনালেখ্য নির্মাণে সর্বদা সচেতন ছিলেন। জীবনকে এত নিগূঢ়ভাবে উপলব্ধির শক্তি তৈরি হয়েছে তাঁর পারিবারিক পরিসর থেকেই। মা রেণুকাময়ী মজুমদারের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞানের পাশাপাশি পিতা প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদারের আন্তরিকতা, উদার মানসিকতা, আত্মনিষ্ঠা, যুক্তিবোধ এই দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর ব্যক্তিমানস গড়ে উঠেছিল। পারিবারিক পরিধিতে শৈল্পিক জ্ঞানের সূচনা ঘটলেও তিনি আজীবন শিক্ষার্থী থেকে গেছেন বৃহত্তর বিশ্ব প্রকৃতির নিকট। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে শানু লাহিড়ীর বক্তব্য :

> মায়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল। পড়ার খুব ঝোঁক। খাটের তলায় নিয়মিত পড়তেন, লিখতেন। প্রচুর বই। বাংলা বই, ইংরেজি বই। বলতে কি প্রথম জীবনে সাহিত্যপ্রীতি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। মা এতো সাহিত্যপাঠ করতেন, আলোচনা করতেন যে আমরা সেই সময়েই অনেক ভারি ভারি জিনিষ জেনে গিয়েছিলাম।[১]

খাঁটি মানুষ মূলত শুদ্ধ মানুষ, নিষ্পাপ মানুষ, সাচ্চা মানুষ, অকলুষ মানুষ, সরল মানুষ, অকৃত্রিম মানুষ। যারা সহজ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সকল প্রকার জটিলতার বাইরে নিতান্ত সাধারণ জীবন যাপন করতে চাইলেও তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়ে দারিদ্র্যজর্জর বীভৎস বাস্তবতার

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

জড়াজালে। তাই বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিরলস প্রচেষ্টায় তারা কখনও কখনও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তবে এই মানবতার স্খলনের পেছনে যে যন্ত্রণাবোধ ও রক্তক্ষরণ সৃষ্টি হয় তাদের অন্তরে যার মাধ্যমেই এ সকল মানুষকে দোষী ভাবা যায় না। তবে বাহ্যিক সংকটের সাথে অন্তরের দোলাচলতা, সংশয়, টানাপড়েন সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যমে তাদের অন্তরকে নিষ্কলুষ অপাপবিদ্ধ করে তুলেছেন গল্পকার। কমলকুমার মজুমদার এই অকলুষ মানবচরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে মানুষের সাথে মানুষের সত্য সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছেন। এই সম্পর্কের সৌন্দর্য নির্ভর করে অন্তরাত্মার শুদ্ধতার উপর। এ প্রসঙ্গে শোয়াইব জিবরানের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> কমলকুমার সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন অন্তরের সাধনা হিসেবে। এ কারণে তিনি তাঁর শিল্পচর্চায় ভাব ও ভক্তিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ভাব ও ভক্তি দিয়ে সবকিছুকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতি লীলাকে, মানবিক বোধকে অরূপ থেকে রূপে রূপায়িত করেছেন অন্তরের ভাবের ভেতর দিয়ে। মানুষ ও মানুষের সৌন্দর্যকে, প্রকৃতি বা সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ভাব ও ভক্তির ভেতর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন।[২]

ইংরেজি ও মিশনারি স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ ছাড়াও সংস্কৃত টোলে অধ্যয়নের মাধ্যমে ভগবৎ সাধনা ও ব্রাহ্মণ্য সাধনার প্রতি আগ্রহী হন কমলকুমার মজুমদার। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনেও তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল। বিদেশি সাহিত্যের অনুকরণে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে চলতি হাওয়া তার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি 'আমাদের চৈতন্যের শেকড়ের টান দেন তাঁর প্রাচীন ঐতিহাসিক ভাষার শিল্পপ্রকরণে এবং দেশজ জীবনের বিশ্বাস ও সংস্কৃতি আশ্রিত পুরুষার্থ-বোধে, সংস্কারের অন্ধ অভ্যাসিকতায় যা ক্ষুদ্র ও সীমিত নয়, শিল্পীর সচেতনতায়ই গভীর এবং সর্বজনীনতার ব্যাপ্তিতে ঐশ্বর্যময়।'[৩] গুরুর কয়েকটি গল্প বাদে তাঁর অধিকাংশ গল্পের সূচনাতেই যুক্ত হয়েছে গুরুবন্দনা। ভক্তরূপে গল্পের সময়, কারণ, স্থানকেও উল্লেখ করেছেন; ক্রমশ বন্দনারীতি আখ্যানের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যকে তিনি লালন করেছেন সাহিত্যের পটভূমিতে। বিশ্বসভ্যতার জটিলতায় সৃষ্ট ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড, অবক্ষয়িত, বিবর্ণ জীবনের মধ্যে তিনি শিল্পী হিসেবে জীবনের শুদ্ধতা ধ্যানের লক্ষ্যে ইষ্টদেবতার আশ্রয়পুষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যায়–

> মাধব ইষ্টদেবতা, ব্রহ্মময়ী মা, মাগো ইত্যাদি মাতৃভাষা, বাংলা, রামকৃষ্ণ গূঢ়তত্ত্ব সহজভাবে বলতে পারেন, তাই তাঁর আশীর্বাদটুকু দরকার, এখানে 'আমরা' প্রাকৃতজন, গ্রাম-সভ্যতার সন্তান, অন্যের মানে ইংরেজিয়ানার প্রভাবপুষ্টরাই অন্য, আমরা তা নই, যা কিছু বাঙালির নিজস্ব তারই কোনও ঘটনা 'ব্যক্ত' হবে। 'ব্যক্ত' বললে 'অব্যক্ত' মনে পড়বেই–সেই গোঙানি, অনুভব, আর্তস্বর প্রকাশিত হবে ভাষায়–লিখিতরূপে–লেখক এখানে এক মাধ্যম মাত্র, যিনি সরলভাবে ওই ঘটনা লিপিবদ্ধ করবেন। গ্রাম্য, 'অতীবগ্রাম্য' বলে সরলতা ছাড়া অন্য ভাব কিছু নেই।[৪]

কমলকুমার মজুমদার বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে জীবনের এক সময় বহু অর্থ উপার্জন করেন। তারপরও ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক সংকট অথচ বনেদী পরিবারের অহং ও আভিজাত্যবোধের টানাপড়েন দেখা যায় তাঁর জীবনযাপনে। এছাড়াও তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের মধ্যেকার সংকটও উল্লেখযোগ্য। বন্ধুমহলের পরিসরে তাঁর অজ্ঞাত বাসস্থান, আর্টের মতো করে নিন্দা রটনা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে বেশি স্বশিক্ষিত হওয়ায় ব্যক্তিজীবনে জটিলতা লক্ষণীয়। তাঁর

ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী জীবনে আপাত অসংগতি ও বৈপরীত্য লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়–

> কমলকুমারের দীর্ঘ জীবন ও সাহিত্যশিল্পে সমান্তরভাবে মুখ ও মুখোশের যে দুটি ধারা প্রবাহিত হয়েছে, সংগোপনে, সচেতনে, কখনও বা একটিকে সরিয়ে অপরটি, কখনও বা দুটিই সমান্তরভাবে প্রাধান্য পেয়েছে–আমরা ভুল করেছি চিনতে কোনটি মুখ আর কোনটি মুখোশ। কিন্তু তবুও সব মিলিয়ে একটি পরিচয় উঠে আসে, আমরা চিনে নিতে পারি কমলকুমার মজুমদারকে।[৫]

ফরাসি ভাষার জ্ঞান, শব্দ ও সুরকে বড় আলেখ্য বিবেচনায় তাঁর শিল্প স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের চলতি কথা ও আচরণের সাথে শিল্পসম্পৃক্ত কাজ ও সাহিত্যের ভাষার কারণে দ্বান্দ্বিকতা দেখা যায়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাথে তাঁর কথোপকথনের মাধ্যমে এ বিষয় উল্লেখিত হয়েছে–

> তাঁর মুখের ভাষা হাট-বাজারের, আর সাহিত্যের ভাষা এত জটিল কেন, এ প্রশ্ন অনেকবার করেছি। তিনি বলতেন, সাহিত্য হচ্ছে বাগদেবী সরস্বতীর সঙ্গে কথা বলা। আমরা যে ভাষায় মাছের বাজারে, মদের দোকানে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলি, সে ভাষায় শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে কথা বলা যায় না, সে জন্য নতুন ভাষা তৈরি করে নিতে হয়।[৬]

কমলকুমার মজুমদার বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রচলিত আধুনিকতা এবং প্রতিভাত বাস্তবতার প্রতি কম বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে অল্পসংখ্যক রচনার দ্বারাই তিনি বাংলা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ব্যতিক্রমধর্মী এই লেখকের উত্তরসুরী আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি সারাজীবনে ঊনত্রিশটি ছোটগল্প, আটটি উপন্যাস ও কিছুসংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' (*নহবৎ*, আশ্বিন ১৩৬৬)। এছাড়াও রয়েছে 'গোলাপ সুন্দরী' (*এক্ষণ*, এপ্রিল-মে ১৯৬১), 'অনিলা স্মরণে' (*দর্পণ*, শারদীয় ১৩৭১), 'শ্যামনৌকা' (সরাসরি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত), 'সুহাসিনীর পমেটম' (*কৃত্তিবাস*, শারদীয় ১৯৬৫), 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' (*এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৭৬), 'খেলার প্রতিভা' (*জার্নাল ৭০*, জানুয়ারি ১৯৭৭) ও 'শবরী মঙ্গল' (*রবিবাসর*, শারদীয় ১৯৮৩)। তাঁর মোট গল্পের মধ্যে চলিত রীতির গল্প আছে পনেরোটি। 'প্রিনসেস' (*উষ্ণীষ*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩৪৪), 'লাল জুতো' (*উষ্ণীষ*, ভাদ্র ১৩৪৪), 'মধু' (*উষ্ণীষ*, পৌষ ১৩৪৪), 'জল' (*সাহিত্যপত্র*, কার্তিক ১৩৫৫), 'তেইশ' (*চতুরঙ্গ*, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৫), 'মল্লিকা বাহার' (*চতুরঙ্গ*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৮), 'মতিলাল পাদরী' (*দেশ*, চৈত্র ১৩৬৪), 'তাহাদের কথা' (*দেশ*, ভাদ্র ১৩৬৫), 'ফৌজ-ই-বন্দুক' (*কৃত্তিবাস*, শ্রাবণ ১৩৬৭), 'নিম অন্নপূর্ণা' (*বক্তব্য*, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭), 'কয়েদখানা' (*পরিচয়*, পৌষ/মাঘ ১৩৬৬), 'জাসটিস' (*পরিচয়*, শারদীয় ১৩৯৪), 'প্রেম' (*গল্পসমগ্র*, আনন্দ ১৯৯০), 'বাবু' (*আজকাল*, শারদীয় ১৩৯৪) ও 'আমোদ বোষ্টুমী' (*দেশ*, শারদীয় ১৩৯৫)। সাধু রীতির গল্পের সংখ্যা চৌদ্দ। 'রুক্মিনীকুমার' (*এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৭৫), 'লুপ্ত পূজাবিধি' (*কৃত্তিবাস*, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৭২), 'খেলার বিচার' (*কৌরব*, শারদীয় ১৩৮৫), 'খেলার দৃশ্যাবলী' (*গাঙ্গেয় পত্র*, চৈত্র ১৩৮২), 'অনিত্যের দায়ভাগ' (*আবর্ত*, আশ্বিন ১৩৮১), 'বাগান দৈববাণী' (*গোলকধাঁধা*, গ্রীষ্ম ১৩৮৩), 'কঙ্কাল এলইজি' (১৩৬৮), 'দ্বাদশমৃত্তিকা' (*এক্ষণ*, শারদ ১৩৮১), 'পিঙ্গলাবৎ' (*কবিতীর্থ*, অক্টোবর ১৯৮২), 'খেলার আরম্ভ' (*এক্ষণ*, শারদীয় ১৩৮৫), 'বাগান কেয়ারি' (*বারোমাস*, শারদীয় ১৩৮৫), 'আর চোখে জল' (১৩৮৪), 'বাগান পরিধি' (*শিরোনাম*, শারদীয় ১৩৮৫), 'কালই আততায়ী' (*কৃত্তিবাস*, শারদীয় ১৯৮০), 'কশ্চিত জীবন চরিত: তিনটি খসড়া' (*কৃত্তিবাস*, শারদীয় ১৩৮৭)। তাঁর প্রথমদিকের গল্প

'প্রিনসেস', 'লাল জুতো', 'মধু' তিরিশের ঘরানাতেই লেখা। 'জল' ও 'তেইশ' গল্পে তাঁর নান্দনিকবোধ সমাজচেতনার স্তরে উন্নীত হয়েছে। 'মল্লিকা বাহার' গল্প থেকে তিনি নিজস্ব ঘরানায় লেখা শুরু করেন। তবে তিনি সবসময় সচেতন ছিলেন এই অকলুষ মানুষের শুদ্ধতা রক্ষার প্রতি। এই অনুভূত উপলব্ধি প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন ভাষার জটিল আবরণ। তাঁর ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে বলা হয়–

> প্রকৃতি বিশৃঙ্খল কিন্তু এই আপাত বিশৃঙ্খলার মধ্যবর্তিতাতেই অভিব্যক্ত হয় তার অন্তর্লীন সহজতার স্বাভাবিকতার ছন্দ। এই সহজতা এই স্বাভাবিকতা সুশৃঙ্খল সবুজ তাজা। সে তার মৌল লক্ষ্য থেকে কখনও ভ্রষ্ট নয়। আদিম মানুষ, প্রাকৃতিক মানুষদের নিজস্ব কথা 'বিস্তারিতে' তাই কমলবাবু প্রকৃতির কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতির আপাত বিশৃঙ্খলাকে গ্রহণ করেছিলেন ভাষার বিন্যাসে এবং তার ভিতর দিয়েই পৌছাতে চেয়েছিলেন সহজ মানুষের অন্তর্লোকে।[৭]

'প্রিনসেস' গল্পের শুরুতে যে ব্যবধান, শঙ্কিত চিত্ত, আর পলায়নপর মানসিকতার বিন্যাস গল্পের সমাপ্তিতে তা চিন্তার সামঞ্জস্যতায় পরিণত হয়। সামাজিক বৈষম্য আর বিভেদের নীতির ধারণায় রাশিয়ার কম্যুনিজম তত্ত্বের বিশ্বাসী গল্পের নায়ক দেবকুমার অপরদিকে স্টেটের প্রিনসেস রাজসিক জীবনব্যবস্থায় অভ্যস্ত। কিন্তু উভয়েই মানবিকতার সৌন্দর্যে বিশ্বাসী। গুটিকতক মানুষের কুক্ষিগত সম্পদে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিলাসিতার পরিবর্তে যদি সকল মানুষ সমভাবে সম্পদকে ভোগ করতে পারে তাহলেই এই বৈষম্যের সমাজে সমতা আনয়ন করা সম্ভব। মানুষকে সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে বিবেচনা করলে মানুষের মধ্যকার সত্য সম্পর্ক স্থাপিত হবে। হিন্দুত্ববাদের বাণীতে মানুষ 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' এ বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনেই আস্তিকতার প্রমাণ মেলে। সামাজিক বৈষম্য তুলে ধরতে লেখক কৌশলে দেবকুমার ও লছমীর পোশাকের পার্থক্য এবং সেবকশ্রেণির সামাজিক অবস্থানকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সামাজিক অবস্থানের বিস্তর পার্থক্যকে সমতায় নিয়ে আসা এবং সমভাবে পৃথিবীকে উপলব্ধির চেষ্টায় লছমী দেবকুমারের চশমা দিয়ে বাস্তবতাকে দেখতে চায়। যে চেতনা শুরুতেই প্রকাশিত হয়েছে দেবকুমারের কথায় তা গল্পের সমাপ্তিতে প্রিনসেস্-এর পরিবর্তে লছমী সম্বোধনে প্রকাশ পায়-

> এক হবো, খাওয়ায় দাওয়ায়, আচারে ব্যবহারে, বেশে বাসে, প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে অণুতে অণুতে আমরা এক হবো–প্রকটিত হ'য়ে উঠবে তোমার আমার সম্বন্ধ, মানুষে মানুষে সম্বন্ধ, চিরকালের, চিরদিনের আজকের, এই সময়ের। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে আমরা তাদের লজ্জার কারণ হবো না।[৮]

'লাল জুতো' ছোটগল্পে কমলকুমার মজুমদার কিশোর বয়সের মনের অবচেতন বাসনাকে সচেতন সত্তায় প্রকাশের লক্ষ্যে 'লাল জুতো'র রূপক ব্যবহার করেছেন। 'লাল' রঙের ব্যবহার মূলত কামনা বাসনার প্রতীকায়িত রূপকেই চিহ্নিত করে। গৌরী ও নীতিশের স্বপ্ন মিলেই একটা শিশু ও 'লাল জুতো'র ইঙ্গিত বাসনাকে ভিন্ন ভঙ্গিতে কিশোর বয়সের প্রেমের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। আবার গৌরীর ব্লাউজের একমাত্র অবলম্বন সেফটিপিনটি নীতিশের শার্টে প্রয়োজন পড়ে বস্তুত কিশোর বয়সের অবচেতন মনের বাসনার বহিঃপ্রকাশে। কিশোর বয়সেই তাদের অন্তরের পারস্পরিক রক্তিম আকর্ষণ থেকেই জন্ম নেয় ভবিষ্যতে একত্রে বসবাসের চিন্তা; যা মূলত নর-নারীর সম্পর্কের আর্কিটাইপ। নীতিশের মধ্যেকার কল্পিত পিতৃত্বের দুর্মর বাসনাকে চিত্রিত করতে গিয়ে লেখক গৌরীকে অবলম্বন করে 'লাল জুতো'তে শিশুর অবয়ব দেন। নীতিশ সেই শিশুরই

প্রতিচ্ছবি সন্ধান করেছে বইয়ের পাতায়, কারণ এই 'জুতো'র উপযোগী পা বাস্তব পৃথিবীতে নেই; যা আছে নীতিশের কল্পনায়। ব্যক্ত বিষয়ের চেয়ে কল্পিত অব্যক্ত বিষয়ে ভাবলোকের বিস্তার আছে অধিক যা তিনি বিবৃত করেছেন এ গল্পে; তার প্রতীয়মান অর্থকে ম্লান না করেও বৃহত্তর দূরগামী সংকেতকে প্রাধান্য দিয়েছেন গল্পকার–

> দেখতে পেল, সুন্দর অনাগত শিশু, যে ছিল তার কল্পনায়; অঙ্গটি তার মাতৃস্নেহের মাধুর্য্য দিয়ে গড়া, যাকে দেখতে অবিকল নীতিশের মত; তার আত্মা যেন শিশুর তনুতে তনু নিল। ইচ্ছে করল বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে–বুকে জড়িয়ে ধরে বেদনা-মাখা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়তে।[৯]

শ্রেণি, সংস্কার, মূল্যবোধ, আদর্শ ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নিয়ে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রোমান্টিকতার দূরত্ব সবকিছু মিলেই ভিন্নধর্মী বাস্তবতা ও কাল্পনিকতার জগৎ তৈরি করেছেন কমলকুমার মজুমদার তাঁর 'মধু' ছোটগল্পে। তিনি রোমান্টিক প্রেমের সমালোচনার বাইরে এসে সর্বতোমুখী প্রেমকে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য দ্বারা প্রভাবিত করেছেন। আবার কলাবতীদের প্রেম কী অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য অতিক্রান্ত কি না তা আলোচিত হয়েছে এ গল্পে। সময়ের প্রবহমানতায় গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে যায় এবং অস্তিত্ব অন্বেষায় কলাবতীরা শহরে আসে, আবার জনবহুল নগরে আত্মিক বিচ্ছিন্নতায় তাদের ত্যাগ করে যায় সকলে। যে জীবন একাই পাড়ি দেয় তারা। গল্পকার ছেঁড়া জামা পড়ে কলাবতীর জীবনের সাথে একাত্ম হওয়ার রোমান্টিক কল্পনা বাস্তবের আঘাতে এক মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে যায়। পুরো গল্পেই লেখক শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রেণিগত বিভাজনের কারণেই এই দ্বন্দ্বাত্মক বোধ প্রকাশিত হয়েছে–

> আমাদের বিবেচনায়, এই গল্পটি একটি বীজগল্প; এবং কমলকুমারের মহীরূহের সম্ভাবনাগুলি এখানে ইশারা হয়ে আছে। যে-ইশারাগুলি সম্ভবত এর পূর্বে তাঁর নিজের কাছেও স্পষ্ট ছিল না; 'লাল জুতো'তেও নয়।[১০]

গল্পের সূচনায় যে নিঃসঙ্গতা তা মূলত লেখকের নিঃসঙ্গতার প্রতিচ্ছবি: 'পৃথিবীতে আমার কেউ ছিল না বললে ভুল করা হবে,বলবো আমি কারুর ছিলাম না।'[১১] রূপ মাত্রই কুহক। কলাবতীর রূপে মুগ্ধ দৃষ্টিতে লেখকের কাছে কলাবতীর জীবনধারণের পন্থা ভালো লেগেছে; অনাড়ম্বর, সুন্দর, স্বাধীন জীবনকেই ভালোবেসেছেন। বিশ শতকেও কলাবতীর জীবনে লোভ, নিজস্বতা, দানবিকতা নেই; সুখ, আনন্দের সজ্ঞায়ন অজানা সেই সরল জীবনকে যাপন করতে চেয়েছেন লেখক। কলাবতীর দেহাতীত সৌন্দর্যের মধ্যে যন্ত্রযুগের কলুষতা প্রবেশের কারণে সে সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়। নিঃসঙ্গ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেই বাস্তবতা আর কল্পনার মধ্যেকার দূরত্ববোধ তৈরি হয় রেললাইনের সমান্তরালের মতো। কিন্তু এই গল্পের সমাপ্তিতে ঐক্যের চেতনায়, অনুভূতিতে সাম্যভাব আসে ভিজে মাটির মধ্যে প্রবাহিত অনন্ত চেতনাকে অনুভবের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সিরাজুল ইসলাম বলেছেন–

> 'মধু' গল্পে মধ্যবিত্তের নিঃসঙ্গতা নিয়ে যে 'বাবু' উপস্থিত, তার শ্রেণীবাস্তবতা, কল্পনাপ্রবণতা নারী-ভাবনা ও নিম্নবিত্তের সঙ্গে সম্পর্কবিলাস শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বিবেচিত। মানব সম্পর্ক সৃষ্টি তার অনুপ্রেরণা নয়, বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতাই তার গল্পের মৌল বাস্তবতা। ফলে মধুবিক্রেতা নারীর 'কলাবতী' নামে মৃত্তিকালগ্ন বস্তিবাসী নয়, –আত্মসৃষ্ট রতিমুখাপেক্ষিতার নিদর্শন।[১২]

নিম্নবর্গের মানুষের জীবন সংগ্রামকে কেন্দ্রে রেখে কমলকুমার মজুমদার 'জল' গল্প রচনা করলেও এ গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মনুষ্যত্ববোধের দ্বান্দ্বিক টানাপড়েন। বাঁধ ভেঙে লোনা জল এসে বন্ধ্যা করে ফেলেছে 'বোলদে' গ্রামের মাটিকে। ফলে বহু কৃষক অস্তিত্ব অন্বেষায় হয়েছে গ্রামছাড়া ফজল ও নন্দের মতো। আবার কৃষকের পেশাও পরিবর্তন হয়েছে অসাম্প্রদায়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগের (প্রকৃতি কখনই সাম্প্রদায়িক নয়) কারণে সৃষ্ট ক্ষুধা ও দরিদ্রতার কাছেও তারা হয়েছে অসাম্প্রদায়িক। এই ছোটগল্পে তৈরি হয়েছে পাপ ও পুণ্য বোধের নতুন সংজ্ঞায়ন–

–'তুমি যে বামুনের গায়ে হাত তুললে
তোমার পাপ হবে না?'
–'পাপ! পুণ্যি বল, কলির আবার বামুন
দুঃশালা'।[১৩]

সামাজিক জিজ্ঞাসাবোধের জায়গাকে কমলকুমার মজুমদার মানবিক আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত করেছেন সহমর্মিতা দ্বারা। ক্ষুধার্ত মানুষের অন্তর্গত নীতিবিশ্বাসকে বিদ্রুপবিদ্ধ করে তিনি আবদ্ধ হয়েছেন মানবীয় অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বময়তায়। ফজল ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ভালোলোক কিন্তু আর্থ-সামাজিক ক্ষমতাকাঠামোর ফলে সে ডাকাতে পরিণত হয়। যার জন্য ঈশ্বরের দয়াকেই গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায়। সম্প্রদায়গত বিভাজন সত্ত্বেও ফজল ও নন্দ অস্তিত্বের প্রশ্নে একই মানুষ 'কানাই'তে রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসী ফজলকে মন্দ 'কানাই'তে পরিবর্তন করেছেন লেখক। আর সেই পরিবর্তিত 'কানাই' স্বভাবের বাস্তবতায় তার মায়ের গালে চড় দেয়। বাড়িতে ফেরার পথে ডাকাতির মালগুলো কিভাবে গ্রহণ করবে তার মা, তার এই চিন্তা আঘাতপ্রাপ্ত হয় যখন ফতিমা প্রশ্নহীনভাবে সন্দেশ খাওয়া শুরু করে। ব্যক্তি মানুষের চেয়ে বস্তু সন্দেশের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপের ক্ষেত্রে তার মধ্যেকার দোলাচলতার যন্ত্রণা প্রকাশ পায়। যে যন্ত্রণাবোধের সূচনা হয় তাদের নামহীনতার মাধ্যমে। নামহীনতার সাথে সাথে তাদের ব্যক্তিত্ববোধও বিলীন হয়ে নন্দ কালো ছায়াতে পরিণত হয় এবং ফজল নিজের শরীরের প্রতিফলিত অন্ধকার দেখে ভীত হয়। নন্দ ও ফজল দুজনেই এই ভয় থেকে মুক্তির প্রত্যাশী। এই যন্ত্রণাবোধ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ফজলের ভালোত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন গল্পকার এবং 'হয়' ক্রিয়ার প্রাধান্য দিয়ে বাস্তবতা থেকে নিজেকে আড়ালের প্রয়াস আছে। তারা এত সরল যে আদিম চাহিদার বাইরে তাদের আর কিছু চাওয়ার নেই। সোনাদানার চাহিদা নেই শুধু বাঁধকে অচল করে দিতে চায় তারা। নিশ্চিত জীবিকার সন্নিধানে তারা ব্যস্ত–

> না আমি কিছুই চাই না সব নন্দ খুড়ো নিক। পরের ধন নেওয়া পাপ, খোদা রাগ করেন। আমি হই ফজল, আমি হই ভালো লোক, লোক না থাকলেও আমি তড়পা গুণেনি, আমি পরের ক্ষেতে ধান কাটিনা, আমি হই ভালো লোক। কেননা খোদা একদিন মুখ তুলে চাইবেন।[১৪]

জীবনের কাছে হেরে যাওয়া এই সকল চরিত্রের মনোভাবনা ও বাস্তবিক পরিস্থিতির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। জনম দুখী ফতিমার একমাত্র জীবিত সন্তান ফজলের দ্বারা অপমানিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। সম্পর্কের বিনাশচিত্র অঙ্কন করলেও কমলকুমার মজুমদার একইসাথে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকেও অস্বীকার করেছেন। প্রান্তিক মানুষের জীবনবাস্তবতায় চরম সত্য

একটাই তা হলো দারিদ্র্য। তাঁর ছোটগল্পের প্রাকৃতজন সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য–

> প্রাকৃতজন নিয়ে কমলকুমারের নিজস্ব একটা মতাদর্শ হয়তো ছিল। তা সাবেকি। জাতি-গোষ্ঠী বিভাজিত বাংলার গ্রামসমাজের প্রাক-আধুনিক গড়ন আর জীবনদর্শন বলতে যা বোঝায়, কমলবাবুর সামাজিক মতাদর্শ তার সঙ্গেই সাযুজ্য রাখার চেষ্টা করত। তাকে সনাতন হিন্দুয়ানি বলে মনে হতেই পারে। তাই বলে বাঙালি সমাজের বাকি অর্ধেক, যারা মুসলিম, তাদের সম্বন্ধে কমলকুমার উদাসীন কিংবা বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, এমন ভাবলে তাঁর প্রতি খুবই অন্যায় করা হবে। বাংলার গ্রামের মুসলিম কৃষক-গৃহস্থ কমলবাবুর প্রাকৃতজনের মধ্যেই পড়ে। তাঁর অন্তত দু-টি গল্পের দু-টি প্রধান চরিত্র বিপন্ন মুসলিম কৃষক-'জল' গল্পের ফজল আর 'তেইশ' গল্পের আর আলম। এদের অন্তরের গোপন খবর কমলবাবু যেভাবে বাঙালি পাঠকের কাছে পৌছে দিতে পেরেছেন, তা খুব কম লেখকই পারেন।[১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদর্শে কমলকুমার মজুমদার প্রভাবিত। এ কারণেই গল্পের সমাপ্তিতে ধর্মীয় গোঁড়ামির ধারায় সামাজিক বৈষম্যকে অতিক্রম করে ফজল বোনকে নন্দের হাতে তুলে দেয়। অন্যদিকে নিঃসন্তান হওয়ার কারণে বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতাবোধ থেকে নন্দ ফজলের বোনকে গ্রহণ করে। বন্যা কবলিত গ্রামে তিন দিনের অনাহারের মধ্যেও শুদ্ধ অস্তিত্বের লক্ষ্যে যে যাত্রা তা বাস্তবতার নিরিখে বহুবার ব্যর্থ হয়েছে। মৃত মায়ের প্রতি শোকের থেকে বেশি শুকনো কাঁথাকে গুরুত্ব দেওয়ায় সেই অসহায়ত্বকে আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন গল্পকার। ফজলের বেঁচে থাকা, ধর্ম ও নৈতিকতার দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত সরল মনের প্রশ্নবিদ্ধতাই এই গল্পের মূল অবলম্বন।

ভূমিদাস শাহজাদের পুত্র আলম বাস্তুচ্যুত হয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজকাঠামোর সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে আত্মবিনষ্টির পথ অবলম্বন করে– তারই আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে 'তেইশ' গল্পে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জরুর চেয়ে গরু গুরুত্বপূর্ণ হলেও আলমের চাষের গরু তার নিজের নয়। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত জমিতে সে শুধু জন মাত্র, খাজনার বিনিময়ে জমি ও জমিতে উদ্বাস্তু রূপে তার স্থান চিহ্নিত হয়েছে। নায়েবের দ্বারা ঢাকঢোল পিটিয়ে আলমের জমি নিলামের মাধ্যমে সে রায়ত থেকে দিনমজুরে রূপান্তরিত হয়েছে, যে সর্বনাশ সদ্য বিধবার আর্তনাদের মতোই ভয়াবহ। গল্পের নামকরণেও আলমের সর্বনাশ, তিষ্টি মারা শব্দের ইঙ্গিতেই 'তেইশ' নামকরণ করেন। ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে বৈষম্যের নীতিই প্রাকৃতিক। গল্পকার সেই মনোভঙ্গিকে বেদনা ও ক্ষোভের সাথে পরিচিত সমাজদর্শন, মূল্যবোধকে অপরিচিত ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেছেন। ভূমি উন্মূলিত আলম সব সময় ভূমিলগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেছে। সর্বস্ব হারানোর পর অবচেতনে ভূমিই যেন তার পেছনে ছুটে চলেছে। এই পরাবাস্তব চিত্রের দ্বারা আলমের অসহায়ত্ব বোধকেই আরো স্পষ্ট করে তুলেছেন গল্পকার। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য দায়ী 'সজ্জন বাবু'দের মতো প্রভাবশালী মানুষ। ভূমিবিচ্ছিন্ন এসব মানুষের প্রতিবাদের অস্পষ্ট ভাষা ক্রমে স্পষ্ট হয় কিন্তু সংঘবদ্ধ উত্তরণ নাই। চল্লিশের দশকের শেষে 'ক্ষেপে ওঠা'র প্রসঙ্গে সমষ্টিবদ্ধ ভাষা আছে কিন্তু বাঁচার তাগিদে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই প্রত্যেকটি চরিত্রের মৌল স্বরূপকে উন্মোচন করতে লেখক বয়ানের ক্ষেত্রে কূটাভাস ও অন্তর্ভেদী শ্লেষের মাধ্যমেই 'সবাই আমরা বড্ড একা', 'বাবুরা সজ্জন' বিরোধার্থক বাক্য ব্যবহার করেছেন। গ্রামের আদিম সরল মানুষের অনুভব ও ভাবনাকে ভাষ্যরূপ দিয়েছেন তিনি গল্পের মাধ্যমে। আলম জীবিকার তাগিদে জয়নার রাখ ডুমনীর চিকিৎসার

মাধ্যমে অন্ধ মানুষে পরিণত হয়। একদিকে 'সজ্জন বাবু'দের সহানুভূতি ও ভিক্ষার আশায় অপরদিকে প্রতিশোধ বাঞ্ছার তীব্র ভাষার পরাজয়ের আত্মগ্লানি থেকে রেহাই পেতে সহজভাবে অন্ধত্বকে বরণ করে নিয়েছেন। কৃষকসত্তা তার অন্তরের সাথে এত ঘনিষ্ঠ যে ভিক্ষার স্বরের সাথে তার গলায় লাঙলের শশস্বর আওয়াজও প্রতিধ্বনিত হয়। 'তুই যতি মানুষ হস্ তো শালাদের কেটে জল খা'[১৬]– শুধু আবেগের তাগিদে স্ত্রীর এ মন্তব্য থেকে আলমের মধ্যে যে প্রতিরোধের বাসনা তৈরি হয়; জনসমষ্টিকে একত্র করার লক্ষ্যে যে প্রচেষ্টা আছে তাতে শাসক শ্রেণির অংশ বিষ্টু সর্দারের ফেলনা অজুহাত, তেমনি তার সমশ্রেণির মানুষের মধ্যেও বিরাজমান ভীতিবোধই তা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। স্ত্রীর প্রতিবাদী যে কথা আলমকে উৎসাহী করে তুলেছিল সেই স্ত্রী-ই তার অন্ধত্বের মাধ্যমে জীবিকা সন্নিধানের ব্যবস্থা করায় খুশি হয়েছিল। নিজের অঙ্গহানি করে জীবন ধারণের নির্মম ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে আলমের মর্মযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে–

> টীউবয়েলের শব্দ আসে, এটা কি টুলটুলি? বাবুরা হয় সজ্জন। টীউবয়েলের কলের শব্দ আসে, কে যে যেমন জল নেয়, এটা কি টুলটুলি! ছ-আনির বাবুরা সজ্জন।
> 'দেখ বউ– এবার ভিক্কে মিলবে রে আমি রাখ ডুমনীর ওষুদ খেয়েছি–জমি গেছে তাতে কি–খাবার আর ভাবনা নেই–ভিক্কে পাব রে আমার উপর সবার দয়া হবে রে–
> 'এখন ও তার গলায় লাঙলের শশস্বর, গলার আওয়াজে আওয়াজে।
> বউ খুসী হয়েছিল।[১৭]

'মল্লিকা বাহার' ছোটগল্পে কমলকুমার মজুমদার বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ের অবতারণা করলেন। কলকাতায় বিশ শতকের ষাটের দশকে চাকুরিজীবী নারীদের জীবনসত্যকে উন্মোচন করেছেন তিনি মল্লিকার স্বপ্ন ও জীবনের ব্যবধানের বর্ণনায়। চাকরীজীবী নারী হওয়ার কারণে স্বামী, সংসার, সন্তানের বাসনা থাকলেও তা অপূর্ণই থেকে যায়। এ গল্প শুধু তার দেহ, যৌনতার বিষয়ে বর্ণনা নয়, এটা মূলত সমাজসৃষ্ট মানসিকতায় নারীর উপর আরোপিত চাপেরও বহিঃপ্রকাশ। একজন যুবতী নারী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেহ অবয়ব আর সৌন্দর্য সুষমা সম্পর্কিত চিন্তার নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে কিভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আলাদা হয়ে আসে তারও দৃষ্টান্ত মল্লিকা। সে নিজের সৌন্দর্য শ্রীর অন্তরালে পুরুষোচিত ক্লান্তি দেখতে পায়। এ নিয়ে প্রথমত সে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে আত্মপ্রকৃতির সাথে। শুরু থেকে বাক্যগুলি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ ও জটিল হয়েছে যা মূলত তার মনের জটিলতার বহিঃপ্রকাশ। আয়নায় নিজের প্রতিকৃতির পাশাপাশি গল্পকার সচেতনভাবে পারিপার্শ্বিকতার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে নারীর অপূরণীয় কামনা বাসনার সাথে আর্থিক টানাপড়েনের দ্বন্দ্বময়তাকে উপস্থাপন করেছেন অত্যন্ত শিল্পিতভাবে–

> এবার মল্লিকা আরবার সাহস সহকারে আয়নার প্রতি চাইল, সেখানেই সে। সে যেন অন্য কেউ আর। এ যেন তার উরল বক্ষদ্বয় নয়, যেন এ কেশসম্ভার আর কারও, আর অন্য কারও। আজ সকালে, আজ খাবার পরে দুপুরবেলা যে, এই তো তুফান ছিল, সে তুফানের কণামাত্র কেন যেমন নেই। তার বাবার বাঁশঢলা কাশির আওয়াজ এবং মায়ের শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড় এবং দুজনের অকাল বার্দ্ধক্যে যে তুফানকে, অপরিসর উঠোনের টেকো গন্ধ বালিখসা দেওয়ালের ঝুল যে তুফানকে কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন করতে পারে নি, এখন কিরূপে একভাবে তা যেমন ছিল না এমতই মনে হয়। মল্লিকা আয়নায় অথবা এও হয় যে আয়না মল্লিকায়।[১৮]

পরিচিত চিঠির বাইরে প্রাতিষ্ঠানিক চিঠির আগমনে মল্লিকা নারী পরিচয়ের বাইরে চাকরে হিসেবে পরিচিত হয়। স্বাভাবিক জীবন, চেনা সুখের বিনিময়ে সে ফিরে পায় অর্থনৈতিক সচ্ছলতা।

পরিবারের আকাঙ্ক্ষা, দারিদ্র্যের বাধ্যবাধকতা মিটাতে সমাজের মনস্তত্ত্বে ও পুরুষতান্ত্রিক বাস্তবতায় মল্লিকা বাহারে পরিণত হয়। আনন্দের মায়ের মতো গিন্নি হওয়ার সাধ অপূরণীয় হওয়ায় শোভনার স্পর্শের দিব্য উষ্ণতা মল্লিকার ভালো লাগে। যে নিশ্চিত জীবনে ঠিকে ঝি রাখা যাবে, রুই মাছের কালিয়া খাওয়ার সাধ মিটবে কিন্তু সে জীবন যেন ঢাউস সাইজের বা পায়ের জুতো ডান পায়ে পড়ার মতো বেমানান। যে সহজ জীবন এক সময় সহজলভ্য আজ সে জীবনের স্বপ্ন দেখাও অর্থহীন। সমাজ সংস্কারের নির্দিষ্ট প্রথাকে ভাঙার মুক্তির চিত্র আছে কাঁচের চুড়ি ভাঙার মধ্য দিয়ে। যে সরল জীবনের কামনা সে করেছিল সে শুদ্ধতা গল্পের সমাপ্তিতে রক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে নারী হৃদয়ের বাসনার কথাও প্রকাশ পেয়েছে। বেলিফুলের সাথে কিছুটা পূজা ও ভোগের ইঙ্গিত যেমন আছে তেমনি মানুষের মধ্যেকার কামনাকে প্রস্ফুটিত করার লক্ষ্যে পরিবেশও ছিল অনুকূল। শূন্য আকাশের শ্যাম নীলিমার আভা, দেওয়ালে পতিত অন্ধকার, ঈষৎ আউড়ানো শাড়ি এবং বেলিফুলের বিনীত গন্ধের মাদকতা সবকিছু মিলেই গল্পের পরিণতিতে সমকামিতার দৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

রুক্ষ প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যেও ধর্মের চেয়ে মানবিক আবেদনের গুরুত্ব পেয়েছে 'মতিলাল পাদরী' ছোটগল্পে। বিহারের অন্তর্গত সাঁওতাল পরগনায় শাল মহুয়ার জঙ্গল, টিলা, পাহাড় আর লালমাটির বর্ণনা তাঁর গল্পে বহুবার পাওয়া যায়। ভালো খ্রিস্টান হওয়া যার একমাত্র বাসনা কমলকুমার তাকে ভালো মানুষে পরিণত করেছেন। মানুষকে বিবেচনায় নিয়ে তিনি ধর্মকে গুরুত্ব দেন নি আবার ধর্মের রাজনৈতিক বোধকে মানবিকতার তাগিদে অনেক দূরবর্তী করে তুলেছেন। 'আমরা দেখব নৈতিকতা ও ধর্মীয় শাসন তছনছ করে শরীর কত বড় হয়ে উঠতে পারে, শরীর নিংড়ে আনন্দ পাওয়ার তৃষ্ণা কুমারী মাতা মেরি'র গল্পটির এক পাল্টা প্রস্তাব উন্মোচন করবে।'[১৯] সাঁওতাল মেয়ে ভামরের পুত্র সন্তান যে মতিলাল পাদরীর 'প্রাণ' স্বরূপ। পাদরি যে সন্তানকে দেবদূত হিসেবে সম্মান প্রদান করল তাকে অপমানিত করল তার মা নিজেই। পাপকে বড় করে দেখায় মানুষের প্রতি অসম্মান ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মতিলাল পাদরি ভামরের সন্তানকে প্রকাণ্ড বনভূমিতে ত্যাগ করতে চেয়েছিল কিন্তু শিশুর ক্রন্দনধ্বনি তাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। নবরূপে শিশুটির জন্ম ঘটে। নৈতিক আত্মশুদ্ধির কারণেই পাদরির অন্তরে শিশুর মতো সরলতা পাওয়া যায়। সে কোনও অপরাধ করতে পারে না। সেই সরল মানুষই কমলবাবুর অনিষ্ট।

মানুষের জন্মের শ্রেণি ইতিহাসকে সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে তাকে খ্রিস্টের মর্যাদা দিয়েছেন গল্পকার। ঝড় ও জলের রাতের নৈসর্গিকতাই যেন মানব সন্তানকে দেবদূতের সম্মান প্রদানের অলৌকিকতার বোধকে আরো প্ররোচিত করে তোলে। গির্জাতে সাঁওতাল রমণীর কোল জুড়ে শিশুর আবির্ভাবকে মতিলাল পাদরির কাছে মানবতার মূর্ত বিগ্রহ খ্রিস্টের আবির্ভাবের মতো মনে হয়েছে। বেথেলহেমের এক অখ্যাত স্থানে মানবপ্রেমিক যিশু খ্রিস্টের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর জন্মের শুভ মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী অসন্তোষ, অসহযোগ ঘটে। একই রকম দুর্যোগ ও বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নবজাতক ভামর পুত্রের জন্মমুহূর্তে। সাঁওতাল রমণীর আবির্ভাবে 'অখণ্ড আকাশে শরতের লঘু মেঘ'-এর মতো পবিত্রতা যেন গীর্জায় প্রবেশ করেছে। বীণা হাড়ি যখন ছেলে সন্তানের খবর শোনালো মতিলাল পাদরির কাছে মনে হলো এ বার্তা যেন ঊর্ধ্বলোক থেকে

নেমে এল; পবিত্রতার পুরস্কারস্বরূপ। অতিলৌকিক কল্পনার প্রশ্ন আসে তার আত্মিক চেতনার মধ্যে-

> কান্নার শব্দ ঝড়কে দাবিয়ে উঠতে চায়। বিশাল অজর প্রকৃতিকে ভীত করতেও চাইছে, আর রোমাঞ্চিত পাদরী কেমন যেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আছেন, এ ঘোর রাত্রে এ কি অসম্ভব কাণ্ড! এত জায়গা থাকতে এই গির্জ্জাঘরে! তাঁর বিস্ময়, মনের মধ্যে কি এক অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছিল, তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল শিশুর কান্নার পিছনের অর্থ যে মন খোঁজে, সেই মন দিয়ে পাদরী কি এক অর্থ খুঁজতে চাইলেন, ক্রমে বৃদ্ধ পাদরীর ভাবান্তর হল। বৃষ্টির মধ্যেই ধীরে ধীরে বাগানে এসেই জলের উপরেই হাঁটু গেড়ে বসলেন, করজোড়ে শুধু বলেছিলেন 'প্রভু'।[২০]

এই সরল মানসিকতার বিপরীতে লোভী, স্বার্থপর, কামপ্রবণ চরিত্রের কলুষতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্যান্য চরিত্রের আচরণে। পিতৃপরিচয়হীন প্রশ্নবিদ্ধ জন্মপরিচয়কে নিম্নশ্রেণির মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে সকলে শিশুকে দেখার মধ্যে একদিকে আত্মগ্লানি বোধ আছে অন্যদিকে ভামরকে দেখার বাসনাও আছে অনেকের। গল্পের প্রতিটি চরিত্রই আলাদা জগতের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বাসের জায়গা দেবতাকেন্দ্রিক কিন্তু তা তৈরি হয় মানবশিশুর দ্বারা। সকল মানুষকে শ্রদ্ধা করার কারণে ধর্ম ও ধর্মীয় বোধের চেয়ে লোকায়ত মানুষের সহজ জীবনদর্শনের প্রতি বিশ্বস্ততা বেশি। মানুষের বৈশিষ্ট্য আঁকতে গিয়ে সমাজের গভীরতম বোধকে স্পর্শ করেছেন কমলকুমার মজুমদার। তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত ধারণা সম্পর্কে এ কথা বলা যায়—

> হিন্দু বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও কমলকুমার ধর্মীয় সীমাবদ্ধতাকে ব্যক্তি, সমাজ এবং দেশ-কালের সম্মুখে স্থাপন করে ধর্মীয় অনুশাসনকে নয় মানুষকে মূল্য দিয়েছেন। ধার্মিক কমলকুমার ধর্মীয় শোষণের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে। চিন্তা-চৈতন্যের ক্ষেত্রে তিনি সংশয়বাদী। লেখকের মানবিকতা বোধ ধর্মের খোলস ফাটিয়ে মানব মুক্তির জয় ঘোষণা করেছে।[২১]

পিতা ও পুত্রের মধ্যেকার মানবিক সম্পর্ক সৃষ্টি কমলকুমার মজুমদারের গল্প রচনার অন্যতম প্রবণতা। পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসা নিবিড় সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন তিনি 'তাহাদের কথা' গল্পে। সামাজিক সময়ের পরিবর্তনে সম্পর্কের জটিলতার আখ্যান হয়ে উঠেছে এ গল্প। পিতার প্রতি অন্নপূর্ণার ভালোবাসার নিষ্ঠুরতা ও অসহায় অবস্থানকে এত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করেছেন কমলকুমার মজুমদার শৈল্পিক কৌশলের মাধ্যমে। সম্পর্কের যে ক্রমজটিল স্তরায়ণ, অবস্থার রূপান্তরে সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা, স্ত্রী ও কন্যার নিষ্ঠুরতার যে চিত্র বালক হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটায়, সেই হৃদয়ধর্মের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। জ্যোতির বুকভাঙা কান্নার রেশ পাঠকের হৃদয়কেও স্পর্শ করে। জ্যোতি পিতার জন্য সকলের দ্বারা লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হয়েও নিঃসঙ্গভাবে ভালোবেসেছে পিতাকে। শিবনাথ স্বদেশী আন্দোলনের জন্য চাকরি ও সংসার হারিয়ে পাগলে পরিণত হয়েছে। বিলেতি পণ্য বর্জনের জন্য আন্দোলনেই তার এ নির্মম পরিণতি; সেই স্বাধীন দেশেই তার সন্তানের লজ্জা নিবারণের জন্য একমাত্র অবলম্বন হয়ে উঠেছে ঐ বিলেতি পোশাক। জ্যোতির বারবার মনে হয় শিবনাথ পাগল নয়। 'ওঁ তত্ত্বমসি তৎ' বুলি আওরানোতে জ্যোতির কাছে মনে হয় 'জ্ঞানীরা এমন হয়, বালকবৎ উন্মাদবৎ, জড়বৎ পৈশাচিকও বটে'।[২২] পিতার কাছ থেকে আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও সে আবেগায়িত কণ্ঠে বাবাকে বারবার ডাকে। তার বালকমনের চিন্তা, ভালোবেসে ডাকতে পারলেই তার বাবা ফিরে আসবে সুস্থভাবে। অন্যদিকে

হেমাঙ্গিনীর মনে হয় তাকে সুস্থ করার জন্য 'শিকড় বাকড়ের' পরিবর্তে 'আগর বাগড় লিগরে'র প্রয়াজন। যা বালক জ্যোতির হৃদয়কে আরো অসহায় করে তোলে–

> কমলবাবুর অধিকাংশ গল্পে ঘুরে ফিরে পিতৃসম্বন্ধের থীমটি আসে: পিতা আমাদের পিতা আমাদের প্রাণদাতা, প্রাণপুরুষ, সৎ, শুদ্ধসত্তা; আমরা সেই আদিম, প্রাথমিক সম্বন্ধেই বাঁচি, বাঁচতে চাই, বাঁচতে গিয়ে মার খাই, আমাদের জীবনের দুঃস্থতা, দৈন্য, হীনতা, ঘরের ঘরণী যে নারী, আমাদেরই ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি, ক্ষুধা তাদের আঘাতে যীশুখ্রীষ্টের মতই সেই সত্তা ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত হয়, সেই রক্তে ও অশ্রুতেই ত' আমাদের বাঁচার স্বপ্ন ও বেদনা সত্য হয়ে ওঠে। শিল্পী তাঁর গল্পগুলোয় এই মৌল সম্বন্ধটিকে প্রায় আর্কিটাইপাল ইমেজ রূপেই ব্যবহার করেন।[২৩]

যুদ্ধক্ষেত্রে একজন মৃত ব্যক্তির স্মৃতি নিয়ে রচিত 'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্প। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের এক স্থানে করতার সিং-এর উপস্থিতি। একজন মৃত মেয়ের সাক্ষাতে একজন ব্যক্তি সৈনিকের মনোজগতে নানান পরিবর্তনের স্মৃতিও বর্ণিত হয়েছে এ গল্পে। মানুষের অন্তর বাসনায় সৃষ্টি, জন্ম, সন্তান, পরিবারের কথা স্মরণ একদিকে, অন্যদিকের বাস্তবতায় বাইরে কামানের আওয়াজ– এই বিপরীতধর্মী স্থানে বেদনার জায়গা, মর্মযন্ত্রণার ইতিবৃত্ত চিত্রিত হয়েছে গল্পে। করতার সিং তার মধ্যেকার মানবিক অনুভবের চিত্রকে প্রকাশ করে কোন আয়নার মাধ্যমে নয়, নিজের অন্তরের প্রতিফলিত বাস্তবতার মাধ্যমে। দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে, বয়নকৌশলকে অবলম্বন করে অনুভবকে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছেন গল্পকার। করতার সিং-এর অন্তরকে অনুপুঙ্খভাবে প্রকাশের চেষ্টা আছে স্মৃতি ও বাস্তবের অনবরত বুননের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সেখানে দৃশ্যের জন্ম হয়। শহরের যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যে গ্রামের পরিবারের কল্পনা, লাঙলের খেত খামারের বর্ণনা আছে। ঘর তল্লাশির লক্ষ্যে সে যেখানে যায় সেখানে ধ্বংসাত্মক ভবনের মধ্যে শ্বেত চাদরের উপর মেয়েটি স্থির হয়ে বসে থাকে। সাধারণ সৈনিকের মতো মেয়েটির সম্ভ্রমহানির চেষ্টা না করে করতার সিং নিজেকে সাচ্চা মানুষরূপে বোঝানোর বহু চেষ্টা করে–

> অবশেষে করতারের আর্ত্ত ব্যাকুল স্বর শোনা গেল, 'কসম আমি মামুলি ফৌজের মত চোর চোট্টা বদমাসের দুশমন নই, আমি, আমি সাচ্চা লোক...সাচ্চা...' বলতে বলতে অন্ধকারে তার গলা যেমত বা আটকে গেল।[২৪]

একজন ফৌজ সৈনিক হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেই যুদ্ধকে অতিক্রম করে সে মানবিক জগতে প্রবেশ করে। মেয়েটিকে ভালোবাসে এ কথাটি বলার জন্য মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে 'আই', 'লাভ', 'ইউ' তিনটি শব্দকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আউড়াতে থাকে। তার বা হাতের উল্কি করা গোলাপকে বারবার ফু দিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এই গল্পে বাস্তবের সাথে অন্তরের কল্পনার এক অভিনব সংমিশ্রণ ঘটেছে বারবার। আলোর প্রত্যাশার কারণেই সে বিপদ সত্ত্বেও টর্চ কিংবা মোমবাতির আলো জ্বালিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতেও পিছপা হয় না। কামানের আওয়াজকে অতিক্রম করে 'আই', 'লাভ', 'ইউ' এই তিনটি শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবিকতা প্রকাশের সাহসিকতা দেখায় যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

বীভৎস খাদ্যাভাবের চিত্র, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, বর্ণবিভাজন, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সংযুক্ত করে অন্নপূর্ণার মতো মা চরিত্র অঙ্কন করেছেন কমলকুমার মজুমদার 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পে। গল্পের সূচনায় যূথীর দরিদ্রতা নিবারণের যে কৌশল; ছেঁড়া জামাটা গায়ে রাখার জন্য হাত উঁচু করে থাকা যা মনে হয় আনন্দের প্রকাশক; ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় তা প্রকাশ করেছেন গল্পকার। দুর্বিষহ ক্ষুধার

যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য মিত্তির বাড়ির পোষা টিয়ার ছোলা চুরির নির্মম দৃশ্য দুর্ভিক্ষ কালপর্বের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ক্ষুধার যন্ত্রণার মর্মান্তিক চিত্র গল্পকার দৃশ্যায়িত করেছেন। কিশোর মনের বাসনায় যূথীর পাখি হওয়ার দুরন্ত অভিলাষ, লতির পিঁপড়ে হওয়ার বাসনার অন্তরালে আছে নিশ্চিত খাদ্য প্রাপ্তির ইঙ্গিত, ফোঁড়নের গন্ধ আসা বাড়ির সাথে সহজ যোগাযোগ। সামাজিক শ্রেণি অবস্থানের অনড়, বিভেদ, বৈষম্যের দৃশ্যাত্মক উপস্থাপনের বাইরেও অস্পৃশ্যতার যে ধারণা তাকে স্তরভিত্তিতে বিন্যাস করেছেন গল্পকার। দুর্ভিক্ষের দরুণ সামাজিক অবস্থানের কারণে তারা কারো কাছে সাহায্য চাইতে পারে না আবার সে দারিদ্র্যকে আড়াল করার হাস্যকর প্রচেষ্টা আছে এ গল্পে। ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করে প্রতিদিন দাড়ি কামাবার টাকা ভিক্ষুকের আছে আর ব্রজের অসহায়ত্বের কারণে সে আত্মপ্রতারণা করে; সে খেলায়ও মেতেছে লতি ও যূথী। গল্পের শুরুতে ভিক্ষুকের প্রতি মানবিকতা লক্ষ করা যায়। এক পর্যায়ে ভিক্ষুকের গলা দিয়ে রক্ত পড়ার কথা শুনে প্রীতিলতার খুশি হওয়া এবং গল্পের সমাপ্তিতে গৃহলক্ষ্মী সন্ত্রাসীর ভূমিকায় চলে যাওয়া শুধু নিষ্ঠুর বাস্তবতার প্রতিফলন মাত্র। সকাল বেলার বর্ণনায় বধূ ও বৃদ্ধার জীবনচিত্রের যে সচেতন পার্থক্য তা একাকার হয়ে যায় ক্ষুধার কাছে। গল্পের নামকরণে ঊণ অন্নপূর্ণার রূপ মাতৃত্বের ক্ষেত্রে পূর্ণতা পায় এক বস্তা চালের বিনিময়ে। সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সাধারণ কুলবধূ নিরুপায় অবস্থায় আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যে অপরাধবোধকে আড়াল করে মা চরিত্রটি তার নারীত্বের রক্তক্ষরণকে অবলম্বন করে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষকে ছাপিয়ে এ গল্প হয়ে উঠেছে মাতৃহৃদয়ের আদিম ভালোবাসার গভীরতার; এ গল্প অন্নপূর্ণা মায়ের।

'কয়েদখানা' গল্পের মূল ঘটনা পূর্বে ঘটে যায়, স্মৃতিসূত্রে ঘটনার বিবরণের মাধ্যমে কাহিনির যোগসূত্র। ক্ষমতাবান শাসক চরিত্র ও মুক্ত চরিত্র শাজাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে। রুনুখগাঁয়ের সাধারণ মানুষ রাঘবপুর জমিদারের প্রজা খাতক নয়, নিজস্ব জমির মালিক হওয়ায় তারা স্বাধীন । তাদের সামাজিক সংগঠনে জমিদার নেই, তারা কাউকে খাজনা দেয় না ভূমিতে অবনত হয়ে কাউকে প্রণাম জানায় না। ঘোতাই মাণ্ডিকে ঈশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ব্রজ গোপাল চৌধুরী বাহাদুর হুজুরের নাতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা মোহনগোপাল চৌধুরী বাহাদুরকে পরিস্থিতির হঠকারিতায় প্রণাম করতে বাধ্য করা হয়েছে। একইভাবে রুনুখপুরের সমস্ত জনতা তার ঠাকুর দেবতার মতো চেহারা দেখে ছোট ছোট কুর্নিশ করে কিন্তু এক্ষেত্রে লেখক স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কেউ আভূমি প্রণাম করেনি, এমনকি তার সার্শির পিছনে আবির্ভাবের সময়ও কেউ সম্মানার্থে কিংবা অভ্যাসবশত দাঁড়ায়নি। তাদের কোম্পানিখ্যাত শাজাদের অনিচ্ছাকৃত প্রণামে ছিল উদ্ধত ভঙ্গি। শাজাদের প্রতিবাদী ও স্বাধীনচেতা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে জমিদারকে সম্মান দেখিয়ে রাস্তা না ছেড়ে দেওয়ার মাঝে। রাঘবপুরের খাস বাড়িতে নবনিযুক্ত জমিদার শাসনযন্ত্রকে অব্যর্থ রাখতে যথেষ্ট সচেতন। ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকে শক্তি আর শক্তিকে প্রকাশ করতে ভয় বা শাস্তিকে যুক্ত করা হয়। স্বাধীন মৌজায় যারা ভূমিপুত্রস্বরূপ তাদের খাজনা দিতে বাধ্য করার জন্য কয়েদখানা পরিদর্শন করানো মূলত ভয় দেখানোর প্রক্রিয়া যার পরিণতি আসে শাজাদের ঘোড়া হত্যার মাধ্যমে। যে ঘোড়া শাজাদের শক্তি, ঐশ্বর্য, গতি ও বীর্যবত্তার প্রতীক। ফলে সকল মানুষ যন্ত্রণার জায়গায় একীভূত হয় এবং কয়েদখানার দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী স্মৃতিচিহ্নের মাধ্যমে তারা সংঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যে প্রতিবাদী চেতনা সরল মানুষের পূর্ব ইতিহাসের ধারায় চলে

আসছে। শাজাদের পিতা ইয়াসিনের খাজনা দিতে অস্বীকৃতির সহজ ভাষা বিন্যাসের মধ্যেও তাদের আন্তরিক শুদ্ধতার প্রকাশ স্পষ্ট। যার বিনিময়ে রক্তক্ষরণের সুস্পষ্ট ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে কয়েদখানার দেওয়ালের প্রতিটি অংশে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য–

> দেওয়ালে ভৌতিক হাতের ছাপ, কখনও ফার্ণের তলে, কখনও বা ফাটলের ধারে। মহাসাগরের নিমজ্জমানের শেষ চেষ্টাটুকু। শাজাদ ভীত হয়েছিল, দুধেল গলায় সে প্রশ্ন করলে, 'এতেক হাতের স্ই ছাপ কেনে গো বামুন, উটা কি লিখা বটে?'
>
> শিবাই নিরীক্ষণ করত উত্তর দিলে, 'মনে লয় যারা ছিল ইখানে তাদের সই ছাপ হবে... উটা ভ-বা-লন্দ...কে জানে কোন শালা।'
>
> শাজাদ কি একটা কথা বলতে চেয়েছিল, দু-একবার শিবাইয়ের দিকে মুখ তুলে বলি বলি করে বললে, 'তুমার কি মনে লয় উয়ার ... মধ্যে' বলে থেমে মাথার ফেট্টিতে ঈষৎ ঠিক দিয়ে এক দমকে বলে গেল, 'উয়ার মধ্যে আমার তুমারও বাপদাদার ছাপ আছে নাকি বটে...'?[২৫]

পিতার মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন পুত্রের ভালোবাসা ও আবেগপ্রবণতা চিত্রিত হয়েছে 'খেলার বিচার' গল্পে। সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে উচ্চবংশীয় কিন্তু আর্থিক টানাপড়েনের সংকটে মানুষের চিন্তা ও কার্যের প্রভেদকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। আত্মসম্মানে বলিষ্ঠ শিক্ষায় অগ্রসর বালকের ভবিষ্যৎ কল্পনায় মায়ের জন্য গহনা কেনার শখ, সুখী সচ্ছল জীবনের বাসনা বারবার তার চিন্তায় প্রস্ফুটিত হয়েছে বর্তমান সংকটময় অবস্থানে দাঁড়িয়ে। যেখানে অতিরিক্ত ভোজনে নাভিশ্বাস প্রায় অবস্থা হয়েছে তার পিতার। বাইরের সকল লোকের কাছে হেয়মূলক, তাচ্ছিল্যসূচক বাক্যবাণ নিক্ষেপ, অন্যদিকে মায়ের নিষেধাজ্ঞা, বাবার অতিরিক্ত আহারে অসুস্থ হয়ে যাওয়া সব মিলিয়ে বালকমনে আঘাত পেয়েছে বলেই সে আত্মপরিচয় লুকোচ্ছে। এই পরিচয় লুকানো মূলত তার বাবার প্রতি অবহেলা নয় বরং আবেগপ্রবণতার জায়গা। পেট ঢাউস, নোলা সর্বস্ব, পেটুক হিসেবে পরিচিতি আবার স্ত্রীর জন্য ছাঁদা বাঁধা ও নেবু পাতা সংগ্রহ করায় বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে তাদের পারিবারিক সম্মান। দরিদ্রতাকে আড়াল করার প্রয়াসে ভদ্রতার যথোচিত ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে সন্তানদের সচেতন করে দিয়েছে 'মা' চরিত্র। দরিদ্র মানুষের প্রতি অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিকেও তুলে ধরেছেন সচেতনভাবে। জীবনপ্রবাহের বিচিত্রতর সমস্যাকে তুলে এনেছেন গল্পকার– যে জীবনে সভ্য সমাজের অনুশাসন উপেক্ষিত হয়েছে। মায়ের নিষেধাজ্ঞাই বারবার বালক হৃদয়ে জেগে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য–

> এই নিমন্ত্রণে আসিবার সময়ে মা পৈ পৈ করিয়া পড়াইয়াছিলেন, দেখ, এমন খাইবে না যাহাতে লোকে হাঘর হইতে আসিয়াছে বলিতে সাহস করে, যাহা দিবে তাহা খাইবে নষ্ট করিবে না, নষ্ট করিলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন, মা লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যান– কখনও যত ভালই লাগুক দ্বিতীয়বার চাহিবে না, পান একটা খাইতে পার তবে দেখিও পিক না জামাতে পড়ে! ভুলিও না তোমরা গরীব মানুষের ছেলেপিলে এতটুকুতেই বদনাম হইবে! প্রথমই হও আর যাহাই হও ![২৬]

'কমলকুমার সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে' গ্রন্থে অনিরুদ্ধ লাহিড়ীর লেখা 'পিতাপুত্র: দায়ভাগ ও ভবিতব্যতা' প্রবন্ধে তিনি 'তাহাদের কথা', 'কয়েদখানা', ও 'রুক্মিণীকুমার' গল্প তিনটির বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের উত্থানের স্বপ্নকে এবং তার বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। গল্পের নিষ্পেষিত মানুষগুলো রক্তাক্ত হয়, সংঘবদ্ধ উত্থান চায় যার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বে মানবিকতার স্খলনও লক্ষ করা যায় । রফিক কায়সারের 'কমলপুরাণ' গ্রন্থে কমলকুমার

মজুমদারের অন্ত্যজ মানুষের জীবন সংকটকে ধারণ করেছেন সমাজের বিভিন্ন বৃত্ত থেকে। মানবাত্মার অবমাননা, মানুষের আত্মিক সংকট, নৈতিক সংকট কোন বাস্তবতার নিরিখে সংঘটিত হয় সেই প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছেন এই সমালোচক। তিনি প্রকৃতির সাথে, মানুষের সাথে, অহমের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিশেষত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের আদিম সুর অনুসন্ধানে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন ব্রাত্যজনের রুদ্ধ জীবন সংকটকে। গল্পকার এ সকল মানুষকে সম্মান জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পসমূহে। মানুষের সামগ্রিক রূপের সন্ধান করেছেন গল্পকার। সমালোচক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য–

> বাংলা সাহিত্যে একজন মাত্র লেখক যন্ত্রণার সেই ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করেছেন, আখ্যানের পর আখ্যানে উন্মোচন করেছেন তার সব বিচিত্র দিক। বাইরে একটা বিরোধিতার গোঁ এই লেখকের মধ্যে আমরা দেখতে পেলেও পেতে পারি। কিন্তু ওই অবস্থানটিই তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে, সাহিত্যে রূপান্তরের, সংকটের রূপ দিতে পেরেছেন এই লেখক –কমলকুমার।[২৭]

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, অকৃত্রিম এসব মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে টিকে থাকার জন্য। বিবেকবর্জিত চালচলনকে কমলকুমার মজুমদার লিপিবদ্ধ করেননি এই সকল গল্পের পটভূমিতে। মানুষের অসহায়তা এবং সেই অসহায়ত্বের বহুরূপী প্রকাশ ঘটেছে কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্পে। এই অসহায়ত্বের বাইরে মানুষ যেতে পারে না, জীবনের এই চরম সত্য ও সীমাবদ্ধতা হয়ে ওঠে এটি অনেক সময়। কমলকুমার মজুমদার তাঁর ছোটগল্পের অন্তর্বয়নে বিন্যস্ত করেছেন এই অনিবার্য সত্যকথন। গল্পের আপাত সরল চরিত্রের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবিক পরিমণ্ডল। সহমর্মিতা দিয়ে সরল মানুষের যাপিত জীবনের রহস্য অনুধ্যান এবং তার বিশুদ্ধতাকে অভিব্যক্ত করার লক্ষ্যে বাক্য প্রকরণ ও শব্দ বিন্যাসে তিনি কৃত্রিমতার আবরণ গ্রহণ করেছেন। এই কৃত্রিমতা আসলে বাস্তবতার ইন্দ্রজাল মাত্র। থিমকে কেন্দ্রে রেখে প্রচলিত বয়ন পদ্ধতির বাইরে এসে বর্ণনাকে আন্তরিকভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস আছে তাঁর ছোটগল্পে। গল্পকার হিসেবে তিনি প্রত্যেকটি চরিত্রের সূক্ষ্ম ও স্পন্দমান ভাবনাপুঞ্জকে শিল্পিতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের শুদ্ধতার প্রয়োজনে। এখানেই তিনি সমকালীন অন্যান্য ছোটগল্পকারের চেয়ে পৃথক; যেখানে তিনি সন্ধান করেছেন দুঃখ-জাগানিয়া খাঁটি মানুষ।

তথ্যনির্দেশ

১. শানু লাহিড়ী, 'সাক্ষাৎকার', "উত্তরাধিকার", (অমিতাভ দাস, অনিরুদ্ধ ভৌমিক সম্পাদিত), কলকাতা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ১৮

২. শোয়াইব জিবরান, *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৯, পৃ. ১৮

৩. নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, 'কমলকুমার মজুমদারের ছোটগল্প', "বিজ্ঞানপর্ব" (রবিন ঘোষ সম্পাদিত), কলকাতা, অক্টোবর ২০১৫, সংখ্যা ৪৯, পৃ. ৫৮

৪. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *কমলকুমার, কলকাতা: পিছুটানের ইতিহাস*, ডিসেম্বর ২০০৫, আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা, পৃ. ১৫-১৬

৫. হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, *কমলকুমার মজুমদার: মুখ ও মুখোশের দ্বন্দ্ব*, কবিতীর্থ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৪৮

৬. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, *অর্ধেক জীবন*, আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ১৫-১৬

৭. আলোক সরকার, 'কমল মজুমদারের মানুষ ও ভাষা', "কবিতীর্থ", কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ৮০

৮. কমলকুমার মজুমদার, *গল্পসমগ্র*, আনন্দ পাবলিসার্স, কলিকাতা, ১৯৯০, 'প্রিনসেস্' পৃ. ৩৭১
৯. কমলকুমার মজুমদার, 'লাল জুতো', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১০. দেবাশিস্ তরফদার, *কমলকুমার: রেখাবলী*, ভাষালিপি, কলিকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯
১১. কমলকুমার মজুমদার, 'মধু', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
১২. সিরাজুল ইসলাম, "কমলকুমার মজুমদারের 'জল' ও 'তেইশ'-এর সমাজবাস্তবতার স্বরূপ", *সাহিত্য পত্রিকা* (এস এম লুৎফর রহমান সম্পাদিত), ঢাকা, ৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১০৯
১৩. কমলকুমার মজুমদার, 'জল', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
১৪. কমলকুমার মজুমদার, 'জল', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
১৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙালিত্ব কাকে বলে?', *প্রজা ও তন্ত্র*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ২০০৫, পৃ. ১৭৫
১৬. কমলকুমার মজুমদার, 'তেইশ', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
১৭. কমলকুমার মজুমদার, 'তেইশ', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
১৮. কমলকুমার মজুমদার, 'মল্লিকা বাহার', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
১৯. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্মৃতির স্বরলিপি', *কমলকুমার, কলকাতা: পিছুটানের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮
২০. কমলকুমার মজুমদার, 'মতিলাল পাদরী', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, 'পৃ. ৭০
২১. রফিক কায়সার, *কমলপুরাণ*, একুশে পাবলিকেন্স লিমিটেড, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ২৩
২২. কমলকুমার মজুমদার, 'তাহাদের কথা', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩
২৩. নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
২৪. কমলকুমার মজুমদার, 'ফৌজ-ই-বন্দুক', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩
২৫. কমলকুমার মজুমদার, 'কয়েদখানা', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
২৬. কমলকুমার মজুমদার, 'খেলার বিচার', *গল্পসমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩-২০৪
২৭. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক রূপকথা', *কমলকুমার, কলকাতা: পিছুটানের ইতিহাস*, পূর্বোক্ত, পৃ.২০২

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, উনচল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮/ডিসেম্বর ২০২১

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'সুড়ঙ্গ': জীবনবাস্তবতা–বিন্দুকে ঘিরে বৃত্ত

রীপা রায়*

সারসংক্ষেপ

যা কিছু প্রকাশিত, গোচরীভূত তা থেকে ভিন্ন কিছুর ইঙ্গিত দেয় সুড়ঙ্গ শব্দ। যা আলোকনীয় নয় অথবা গভীর-নিবিড় অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে যে আলোময় খনি– দুটোরই ইঙ্গিত বহন করে সুড়ঙ্গ। সেই জ্যোতির্ময় সুড়ঙ্গ নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন রাবেয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি সামাজিক বিন্যাসের অন্যান্য স্তর যেভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, অন্যান্য চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তা তুলে ধরেছেন। একক নারী চরিত্র ও শক্ত চরিত্র কিশোরী রাবেয়া। সামাজিক উদ্ভাস ও রূপবিন্যাসের অপব্যবহার করে টিকে থাকতে চায় রেজ্জাক, ডাক্তার, কলিমউদ্দিন, যুবক চরিত্র। সমাজ-সংস্কৃতিতে বিরাজিত এই চরিত্রসমেত পরম্পরায় অপব্যবহার করতে থাকে সমাজের এক একটি সেক্টরকে। ফলত সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে গতানুগতিক নর্দমা তৈরি হয়। এই নর্দমাতে ক্রমাগত ভাসতে থাকে নেতিবাচক মনোভাব, চিন্তার অপরিপক্বতা, লোভ-লালসার ক্লেদ। ক্লেদযুক্ত বৃত্তায়তনে ক্রমাগত দৌড়াতে থাকে তারা। কর্তৃত্বের দৌড়, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৌড়, পরিশ্রম না করে আয়েশি জীবনের দৌড়। রাবেয়া সেই সৃষ্টিশীল নতুন মানুষ, যে কিনা তাদের দৌড়ে শামিল হয় না। রাবেয়ার কথাবার্তায় যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা আছে তা মননে ও চিন্তনে নাড়া দেয়। মৌলিক কথা বিন্দু বিন্দু করে জমতে থাকে। অসম্ভব বা বিরুদ্ধ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সত্য এমন বাক্যালঙ্কারের কাছে অবশেষে পরাজিত হয়। পরিশেষে আলো-আঁধারি জগতের ইতি টেনে নতুন সম্ভাবনাময় জগতের ইঙ্গিত রেখেছেন নাট্যকার।

সুড়ঙ্গ শব্দটির তাৎপর্য–গহীন আঁধার, যে আঁধার চোখের আড়ালে থাকে, প্রকাশিত নয় রহস্যাবৃত, হতে পারে তা বস্তুগত অথবা মনস্তাত্ত্বিক জগৎ। যেখানে প্রবেশের জন্য কায়িক শ্রম ঘটে অত্যধিক পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক জট বাঁধতে থাকে। মানুষের এই অসহজ যাত্রার কথা নাট্যকার 'সুড়ঙ্গ' নাটকে বলতে চেয়েছেন। মানুষের মনের মাত্রাতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো সুড়ঙ্গের অন্ধকারের মতো ঢাকা থাকে। উপরিকাঠামো জীবন যাপনের আড়ালে লুক্কায়িত থাকে। যদিও নাট্যকার বলেছেন "নাটকটি প্রধানত কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা, তবে তরুণমনা বয়স্করা যারা সম্ভব অসম্ভব নিয়ে তেমন মাথা ঘামান না, তারা এটি পড়ে বা দেখে আমোদ বোধ করবেন বলে আশা রাখি।"[১]

'যারা সম্ভব অসম্ভব নিয়ে মাথা ঘামান না', এই কথাটি জুড়ে দিয়ে নাট্যকার 'সুড়ঙ্গ' নাটকের মর্মার্থ কিশোর-কিশোরীদের চিন্তার পক্বতা ছাপিয়ে যে অন্য কিছু বোঝায় তা স্বচ্ছ করে দিয়েছেন।

---

* সিনিয়র লেকচারার, ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগ, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ঢাকা।

আতোয়ার রহমানের মতে "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নব্যবাদী, প্রতীকাশ্রিত নাটক সুড়ঙ্গ (১৯৬৪) রচনা হিসেবে পরীক্ষামূলক এবং সত্যই সার্থক।"[২]

তিনি আরো বলেছেন "গ্রন্থখানি ঠিক ছোটদের জন্য নয়। ...এ নাটকের বিষয় কিশোরদের জন্যে দুষ্প্রাপ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুশলীদের আচরণ আর কথাবার্তা-কাহিনীর জন্য যদিচ অবান্তর বা অশোভন নয়–শিশুতোষ নাটকের অনুপযোগী।"[৩]

'সুড়ঙ্গ' নাটকের প্রকৃত বিষয়–মানুষের যাবতীয়, পার্থিব ক্যানভাসে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ, উপরে উঠবার নেশার মত্ততা। মত্ততার দৌড়ে মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, জট বেঁধে যায় মানবিক–সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্র-পরিসরে, মানুষ কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে ওঠে। 'সুড়ঙ্গ' নাটকে এই বিষয়গুলোকে নাট্যকার রূপক, সংকেতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

নাটকটির সংক্ষিপ্ত কাহিনি হলো, পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে রাবেয়া, পরশুদিন যার বিয়ে–অসুখের ভান করে বিছানায় শুয়ে আছে। চিন্তিত পিতা রেজ্জাক; মেয়ের আরোগ্য কামনায় ডাক্তার, হেকিম তারপর আনেন এক ফকির সাহেবকে। সিন্দুকের লোভে ছদ্মবেশে ফকিরের সাজপোশাকে আসে রাবেয়ার চাচাতো ভাই কলিমউদ্দিন। কলিমউদ্দিন আজ পাঁচ বছর ধরে শহরবাসী। সিন্দুকের অভিসন্ধিতে কলিমের বন্ধু যুবক সহযোগী। যুবক নকল নকশা দিয়েছে কলিমকে। আসল নকশা ধরে যুবক রাবেয়ার ঘরের বাহির থেকে সিঁধ কেটে সুড়ঙ্গে পৌঁছে যায়। কলিম নকল নকশা অনুসরণ করে রাবেয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গে যাবার চেষ্টা করে। অবশেষে কলিম রাবেয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে এবং বাহির দিয়ে সুড়ঙ্গে পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে যুবকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে রাবেয়ার পিতা রেজ্জাক, ডাক্তার, পরিচারক কলিমের সহযোগী কয়েকজন। অবশেষে উদ্‌ঘাটিত হয় যে, রাবেয়াদের বাড়িতে সিন্দুক বলতে কিছু নেই। সিন্দুক বিষয়টি স্রেফ জনরব। কলিমের সঙ্গে যুবকের সংঘর্ষ থেমে যায়। যুবক চলে যায় এবং কলিমের সঙ্গে রেজ্জাক সাহেবের আত্মীয়তার পরিচয় ঘটে। রাবেয়ার সন্তুষ্ট মুখমণ্ডলের মধ্য দিয়ে নাটকটির ইতি হয়ে যায়।

'সুড়ঙ্গ' নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলো রাবেয়া এবং একক নারী চরিত্র । নাট্যকার রাবেয়া চরিত্রটি নির্মাণে সমাজ-পরিবারে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনাকে নাড়া দিয়েছেন। নারী হয়ে ওঠার প্রাক মুহূর্তে পনেরো, ষোল বছর বয়সের কিশোরী রাবেয়ার সকৌতুক প্রবণতা, চমৎকৃত কথাবার্তাকে নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। রাবেয়া সোজাসাপ্টা, স্পষ্ট কথা বলে। তার সহজ, অকপট উক্তিতে কেবল প্রত্যক্ষ কথা থাকে না একইসঙ্গে সহজ কথার তল থাকে, অনেক সুপ্ত কথা থাকে। তার সুপ্ত কথাগুলো প্রত্যক্ষ কথার চাইতে গভীর অর্থবহ।

রেজ্জাক, পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ফকিরি সাজপোশাক–ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ডাক্তার–চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ধ্বজা জাহির রাখে। সুড়ঙ্গে প্রবেশের দ্যোতনার পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যকার তরুণ সম্প্রদায়ের অবক্ষয়কে তুলে ধরেছেন। সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে মেয়েটির সরল-সহজ স্বীকারোক্তি, চলা বলা কুপোকাত করে। রাবেয়া ব্যতীত প্রত্যেকেই সামাজিক হাল চালের নেশায় পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়।

রাবেয়ার বিয়েতে অমত নেই, বিয়ের পাত্র অপছন্দ নয় তবুও অসুখের ভান করে সে বিছানায় শুয়ে আছে। পিতার কর্তৃত্বপরায়ণতা তাকে ভীত করে, তার ভানের প্রবণতা বেড়ে যায়।

রাবেয়া– "আব্বা, অত চেঁচাবেন না। চেঁচালে মনে হয় মস্ত-মস্ত ঢেউ এসে আমাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে"।[৪]

রেজ্জাক– "ডাক্তার -হেকিম যদি ভুল করে থাকে তবে তারা আমার হাত থেকে নিস্তার পাবে না, ডাক্তার দুটিকে কঙ্কাল বানিয়ে তাদের হুকে ঝুলিয়ে দেব, হেকিমটাকে হামানদিস্তায় ছেঁচে বড়ি বানাব।"

রাবেয়া– (আচমকা ক্ষীণকণ্ঠে আর্তনাদ করে।)[৫]

পরিবারে প্রচলিত কর্তৃত্বপরায়ণতা এবং পাশাপাশি প্রাণের স্পন্দন নাট্যকার তুলে ধরেছেন। পরিবারে অভিভাবকের মতামত, ইচ্ছা, নিয়ম-শৃঙ্খলা সবসময় বজায় থাকে। সেক্ষেত্রে সন্তানের মতামত প্রাধান্য পায় না। অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণে সন্তানের ইচ্ছা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায়। সন্তানের জীবনগতি এমনকি শিশুতোষ খেলার প্রকরণ অভিভাবক দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। নিজস্ব চিন্তা-চেতনার ছায়া ফেলে সন্তানের জীবনের গতিপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে অভিভাবকের আত্মসুখ মুখ্য হয়ে ওঠে। সন্তানের প্রতি এরূপ শাসন, সুশাসনে পরিণত হয়ে ওঠে না যেখানে কর্তৃত্বের কাছে প্রাণের স্বাভাবিক গতি আড়ষ্ট হয়ে যায়।

বৃক্ষ তার আপন গতিতে ডালপালা মেলে দেয়। মানুষের হাতে অস্ত্র থাকায় বৃক্ষকে কর্তিত করে দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয় মূলত মানুষের জন্য। মানুষের এই তত্ত্ব-সংস্কৃতি রাবেয়ার খেলার প্রাণকে রুদ্ধ করে দেয়।

রাবেয়া– (নড়েচড়ে উঠে গা-মোড়ামুড়ি দেয়, তারপর ফ্‌িক করে হেসে) "কেউ অত হাঁকা-হাঁকি করলে কার না বুক কাঁপে? কিন্তু আব্বার জন্য ভাবনা নেই। তাকে আমি জানি। এই সুযোগে তিনি একে ধমকাচ্ছেন, ওকে মারছেন, গলা ছেড়ে হাঁক ডাক করছেন। মোটকথা, দিব্যি সুখেই আছেন।"[৬]

পিতার কর্তৃত্বপরায়ণতা, প্রবল প্রতাপ ইত্যাকার সামাজিক সুশাসনের পরিচয়ে রাবেয়ার প্রাণের আকুতি অসুখের ভানে পরিণত হয়েছে। পিতার স্বাভাবিক মনোভাব বহাল থাকলে মেয়েটিকে ভানের আশ্রয় নিতে হতো না। এজন্য ডাক্তার, হেকিম, ফকিরি কাঠামো মেয়েটির ভানের কাছে হার মানে। মেয়েটির ভানের প্রবণতা চিন্তিত পিতা বুঝাতে না পারলেও পিতার প্রতাপের মধ্য দিয়ে পিতার সুখে থাকা সম্পর্কে রাবেয়ার স্বচ্ছ ধারণা আছে। কর্তৃত্ব হার মানে প্রাণ প্রাচুর্যের কাছে।

রাবেয়া– "শুধু বড়াই করে বলেন যে বাজপাখীর মতো তাঁর দৃষ্টি। ... তাঁর দৃষ্টিশক্তি সত্যি যদি বাজপাখীর মতো চোখা হত, তাহলে তিনি আপনাকে ঠিক চিনতেন। আমি তো চিনেছি।"[৭]

পিতৃতন্ত্রের সুচালো দৃষ্টিতে ফকিরি লেবাসের আড়ালে কলিমকে চিনতে পারেনি রেজ্জাক। অথচ রাবেয়ার সোজা-সরল চোখে সহজেই অসরল কলিমের চেহারা এবং প্রবৃত্তি ধরা পড়েছে। আত্মপ্রবণতায় মোহাবিষ্ট হওয়ায় কলিম সহজেই ফাঁকি দিতে পেরেছে চাচা রেজ্জাককে এবং একই কারণে কলিম ভেবেছিল রাবেয়া তাকে চিনতে পারবে না, সহজেই পার পেয়ে যাবে কলিম। বৈষয়িক বিষয় থেকে দূরবর্তী রাবেয়ার কাছে সহজেই প্রত্যেকের প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়ে।

রাবেয়া- "অসুখ নয়, বিয়েতেও অমত নেই, অথচ এঘর ছাড়তে পারি না। মুসকিল তো সেখানেই... সে-আওয়াজই-তো আটকে রেখেছে বিছানায়... ঐ আওয়াজ-কাঠঠোকরার মতো ঠুকঠুক সে আওয়াজ, যার কথা কাউকে বলাও যায় না। আওয়াজটা যেন বিচিত্র কোনো দুনিয়ার অজানা অচেনা জীবনের পদধ্বনি।"[৮]

রাবেয়ার অন্তঃকরণে জীবনীশক্তি আছে। প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের ছোঁয়া, প্রাণপ্রাচুর্য আছে রাবেয়ার। মুক্ত জীবনের ছন্দ রাবেয়া সুপ্ত করে রাখে আন্তঃকরণে, আপন ঘরের মাঝে মুক্ত জীবনের ঠুকঠুক শব্দ সে শুনতে পায়, যে শব্দ থেকে পার্থিব দৌড়ের মানুষগুলো থাকে বহুদূর...।

রাবেয়ার বয়স কম; অভিজ্ঞতা কম, তাই জটিলতা সে জানে না। নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মতো ছক কষতে রাবেয়া শেখেনি। অতিরিক্ত আত্মসচেতনতায় মানুষ দমন নীতিতে ধাবিত হয়ে থাকে, পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যায় নিজেরই অজান্তে। তখন মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে অপরের জন্য অকল্যাণকর হয়ে ওঠে। রাবেয়া ব্যতীত নাটকের অন্যান্য চরিত্র আত্মমোহে নেশাগ্রস্ত। কলিম পীরগিরির মধ্য দিয়ে সিন্দুকের লোলুপতায় দৌড়াতে থাকে, যুবক চালাকিতে পারদর্শী, ডাক্তার বুদ্ধিমত্তা জাহির রাখতে চায়, রেজ্জাক পিতৃত্বের কর্তৃত্ব দেখায়। কোথাও যেন প্রাণের ছোঁয়া নেই। এই বৈষয়িক মানুষের ভিড়ে রাবেয়া ভীত, আতঙ্কিত। রাবেয়া নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারে না বৈষয়িক দৌড়ের সাথে- "কিন্তু কী করি, আমি যে এ ঘর ছাড়তে পারি না"–রাবেয়া।[৯]

রাবেয়া আত্মার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও প্রাণস্ফূর্তির দিকে গতিময়। প্রাণের গতিময়তার ঠুকঠুক শব্দ রাবেয়াকে ঘর ছাড়তে দেয় না। বাইরে সিঁড়ি টপকানো অবারিত দৌড়ের কাছে মেয়েটির প্রাণের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। তার 'ফিক করা হাসি' 'মুচকি হাসি' প্রাণপৈতিচেতনা- প্রাণের সিন্দুক। হেয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে রাবেয়া যে শক্তি বৈষয়িক জগতে ছুঁড়ে দেয় তাই হলো রাবেয়ার সিন্দুকের দ্যুতি। মানুষের কল্যাণ, শুভবুদ্ধি রাবেয়ার সিন্দুকের ধনরত্ন।

রাবেয়ার অসুস্থতার অসিলায় আসে ফকিরি বেশে কলিম। জনরবে শোনা সিন্দুকের কথা তাকে দিক-দিশেহারা করে দেয়। চাচার চোখে ধুলো দিয়ে সে রাবেয়ার ঘরে প্রবেশ করে। রাবেয়াকে সুস্থ করতে সে রাবেয়ার পিতার কাছে খোন্তা শাবল চেয়ে নেয়। কন্যার সুস্থতা কামনায় রেজ্জাক ফকিরের গায়েবি কথাবার্তা মেনে নেয়। নাট্যকার এখানে তার অন্য দুটি নাটক 'বহিপীর' এবং 'তরঙ্গভঙ্গ'র মতো পীর ফকিরদের আচরণ তুলে ধরেছেন। ধর্মকে অবলম্বন করে মিথ্যাচার এবং

অন্যায্যতার পথে পীর ফকিররা তাদের স্বার্থ হাসিল করে থাকে। পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমরা যতই বিজ্ঞানমনস্ক হই না কেন জীবনের চূড়ান্ত সংকট মুহূর্তে অলৌকিক প্রতিভাসে আস্থাশীল হয়ে থাকি। রাবেয়ার পিতা রেজ্জাক তাই বলে- (চড়া মেজাজে ফকিরকে) "একটা কথা প্রথমেই সাফ সাফ বলে দিতে চাই! আমি পীর-ফকিরে মোটেই বিশ্বাস করি না। এ কথা বলার জন্য আমার মাথার ওপর আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমার অবিশ্বাস ভাঙ্গবে না। তবে আপনি যখন মেয়েকে ভালো করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, আর আমি যখন নেহাতই নিরুপায় হয়ে পড়েছি"।[১০]

কলিমের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দুটি চরিত্র চিত্রিত করেছেন। চরিত্র দুটি সমাজের দুটি শ্রেণিকে চিত্রিত করেছে। একটি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় এবং অন্যটি পীর-ফকির সম্প্রদায়। কলিমের সঙ্গে দুরভিসন্ধিতে সামিল হয়েছে কলিমের যুবক বন্ধু। দুজন শিক্ষিত যুবক, তারা সিন্দুক খুঁড়ে ধন সম্পদ নিয়ে আরাম আয়েসে জীবন অতিবাহিত করতে চায়।

সমাজের প্রগতিতে ভূমিকা রাখে যুবক সম্প্রদায়। সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হলো যুবক সম্প্রদায়। সমাজ বিনির্মাণে যুবকের মেধা, শক্তি, কর্মস্পৃহা একটি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে আধুনিক সময়ে যন্ত্র সভ্যতায় বাঙালি যুব-সমাজ নিজেদের শিক্ষা এবং শক্তির মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষীণ মেধার পরিচর্চা এবং যন্ত্রের তরিকার উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতায় যুব সম্প্রদায়ের নিজস্ব চিন্তার পরিধি সংকুচিত হয়ে আসছে। নিজেকে নির্মাণ করে জাতির জন্য আগামী দিনের ভবিষ্যৎ সম্পদ হতে অপারগ তারা। যুব-সমাজের কর্ম-বিমুখতা, অবিবেচনা বাঙালি জাতির অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকার তরুণ সমাজকে যেভাবে দেখতে চেয়েছেন সেইভাবে দেখতে না পেয়ে কলিম এবং যুবক, এই দু'জনের চরিত্রচিত্রণের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে কটাক্ষ করেছেন।

যুবক সিন্দুক আত্মসাৎ করতে অনেক বেশি সচেতন। অন্যায়ভাবে সিন্দুক হস্তগত করতে কলিমের তুলনায় সে চালাকিপনায় পারদর্শিতা দেখায়। কিন্তু চালাকিপনায় সফল হতে পারেনি যুবক। তার ভীরুতা এই অসফলতার কারণ। যুবক সিন্দুকের অবস্থান সম্পর্কে কলিমকে নকল নকশা দিয়েছে। সে আসল নকশা ধরে বাইরে থেকে একটু একটু করে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে সোনা-দানা, আরাম-আয়েসি জীবনের ব্যবস্থা আছে। সিন্দুকে পৌঁছে যুবক দেখে নিয়েছে সেখানে কিছু নেই। হতাশ হয়ে সে এখন সিন্দুকের অন্ধকার থেকে পালাতে চায়।

রাবেয়া- ..."আপনি খাটের তলায় দিব্যি লুকাতে পারেন, কেউ দেখবে না। আমার ছাগলটাকে সেখানেই রাখতাম, কেউ জানত না।"[১১]

গৃহপালিত পশুকে আহার, নিদ্রা, বাসস্থানের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়। পালক প্রভুর কাছে পালিত হয়ে থাকে গৃহপালিত পশু। নাট্যকার যুবককে গৃহপালিত পশুর সাথে বিবেচনা করেছেন যেখানে যুবকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গৃহপালিত পশু হিসেবে তফাৎ নেই। শিক্ষিত যুবক, অথচ সে কর্মবিমুখ। লোভ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

অবশেষে রাবেয়ার বুদ্ধিমত্তায় যুবক, কলিমের ফকিরি লেবাস গায়ে চাপিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এই পর্যায়ে সে ডাক্তারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সমস্ত অভীষ্ট লোভের জট ছাড়িয়ে রাবেয়া ফিক করে হেসে গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে বিছানা থেকে উঠে বসে–"বাপরে, কী ক্ষিদে পেয়েছে। কিন্তু তা বিচিত্র কি?"–রাবেয়া।[১২]

'Human ambition and aspiration these are volte-face ambition.'[১৩] মানুষের চূড়ান্ত এমবিশন হলো টগবগ-করা ফুটন্ত এমবিশন যেটাকে ঘোড়ার খুঁড়ের টগবগ শব্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে।

এমবিশন নেতিবাচক কিছু নয়। কিন্তু তা পাবার চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আকর্ষণ থেকে প্রলোভনে তাড়িত করে থাকে। মানুষ তখন দিক-দিশা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এই পর্যায়ে নৈতিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে মানুষের।

ক্ষমতা হাতে পাবার পরে সেটিকে টিকিয়ে রাখতে এবং ক্রমবর্ধমান গতিতে ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে মানুষ বিপথগামী হয়ে থাকে। এমবিশনের লোভ তাকে গ্রাস করে, আরো বড় হওয়ার স্বপ্ন তার ভেতরে ত্রাস সৃষ্টি করে থাকে। এটা অনেকটা ক্লাইমেক্স এবং অ্যান্টি-ক্লাইমেক্সের মতো, একদিকে যেমন ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং আকাঙ্ক্ষা চূড়ান্ত রূপ নিতে থাকে অন্যদিকে তেমনি তার ভেতরটা ক্রমাগত অন্তঃসারশূন্য হতে থাকে। মানুষ ক্রমাগত ভালো-মন্দ, ন্যায়-নীতি, ঠিক-ভুল, ন্যায্য-অন্যায্য বিচারের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এভাবে ক্রমাগত সে মানবিকতার বাইরে চলে যায়। কলিম– "সুড়ঙ্গের মাথায় চাচাকে বসিয়ে দিয়েছি দো নলা বন্দুক দিয়ে। চাচা সুড়ঙ্গের মুখে ওত পেতে বসে আছেন, একটা ইঁদুরও পালাতে পারবে না। ...কিছু যদি বেরিয়ে আসে আলমারির পেছন দিয়ে, একটা ইঁদুরও যদি আসে, কোনো কথা নেই, শাবলটা মাথায় বসিয়ে দেবেন, মানুষ বিচার করবেন না।"[১৪]

সুড়ঙ্গে পৌঁছাবার জন্য ভুল নকশা দেবার কারণে ক্ষিপ্ত কলিম তার যুবক বন্ধুকে খুন করতে উদ্ধত হয়েছে। এই খুন যাতে অসফল না হয় এ জন্য সে প্রাণীকুলের যে কোনো জীব এমনকি ভীতু ইঁদুরের মাথায় শাবল বসিয়ে দিতে প্রস্তুত।

সিন্দুক নিয়ে কলিম এবং তার যুবক বন্ধুর পরিকল্পনার যে জটাজাল-হত্যাযজ্ঞ, উদ্ধতপনা যেটা মানুষের ভেতরে থাকা volte-face ambition-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে পাশাপাশি রাবেয়ার পিতা রেজ্জাক এবং ডাক্তারের ক্ষমতার চর্চাকে ক্লাইমেক্স এবং অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স বলা যেতে পারে।

রাবেয়ার পিতা রেজ্জাক পিতৃত্বে ক্ষমতার চর্চা করে থাকে এবং ডাক্তার চিকিৎসা বিদ্যায় ক্ষমতার চর্চা জারি রাখে।

ডাক্তার: (ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকে) "কোনো ভাবনা নেই। আমি জানি কী দিতে হবে। মর্ফিন, মর্ফিন। ভাগ্যিস এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখি বাড়িতে হৈ-হুলস্থূল পড়ে গেছে। কিন্তু কোনো ভাবনা নেই।"[১৫]

আফিম হতে তৈরি নিদ্রাদায়ক ঔষুধ হলো মর্ফিন। অর্থাৎ রাবেয়াকে চেতন থেকে অবচেতনে নিয়ে যাবার দায়িত্বটি স্বেচ্ছায় পালন করে ডাক্তার। চেতনায় থাকা মানে বাস্তবতার সঙ্গে থাকা। রাবেয়া বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না বরং বাস্তবতার অন্তরালে সত্যকে 'ফিক করা হাসি' দিয়ে দেখিয়ে দেয়। বাস্তবতায় মানুষ যে অর্থে মানুষ-মানুষের নৈতিকতা, সুবিবেচনা, শুভবুদ্ধি, ক্ষমতার সৌন্দর্য রাবেয়া সেই কথাই বলতে চেয়েছে। রাবেয়ার কথার মাঝে যে বক্তব্য আছে, ব্যঙ্গের মাঝে যে অনুকূল সমালোচনা আছে যেখানে ক্ষমতাধারীরা রাবেয়ার কথার কাছে টলতে থাকে।

রাবেয়া– "আপনি এ দিকে তাকাবেন না ডাক্তার সাহেব। ... যার যা কর্তব্য তা পালন করা উচিত, এতে কখনো যেন অন্যথা না হয়। ইস্কুলের বইতে তাই লিখা আছে সাফ-সাফ ... সে সব উচ্চমার্গের কথা আপনি বুঝবেন না। ডাক্তারি বইতে ও সব লেখা থাকে না।"[১৬]

ডাক্তার– (হঠাৎ সজোরে মাথা নেড়ে) "কী হল আমার! মস্তিষ্কের গোলযোগের জন্য যাকে মর্ফিন দিতে যাচ্ছিলাম, তার কথায় কান দিচ্ছি কেন? (হঠাৎ শাবল ফেলে ছুটে বেরিয়ে যেতে-যেতে) ধর, ধর তাকে, ধর, ধর।"[১৭]

ডাক্তার স্বেচ্ছায় রাবেয়ার সুস্থতা অসুস্থতায় নাক গলায়। প্রকৃতপক্ষে মেয়েটির শ্লেষসূচক 'ফিক করা হাসি' 'মুচকি হাসি' এবং ভানের নাটকীয়তা প্রত্যেকের অভীষ্ট যাত্রা দৌড়ের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেকের ক্ষমতার চর্চা বহাল রাখতে ডাক্তার মেয়েটিকে মর্ফিন দিয়ে চেতন জগৎ থেকে অবচেতনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মেয়েটির কথার খেলায় যে সাবলীল আত্মা আছে তা কর্তৃত্বকে মলিন করে দেয়। সচরাচর মানুষ ভাবতে চায় অথবা ভাবতে পছন্দ করে থাকে, যে কোনো বিষয়ের শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছানো হলো মানুষের আত্মতৃপ্তির একমাত্র পথ।

রাবেয়া– "জনরব অতোভুয়ো হয় কেন?"[১৮] লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৌড়, মানবতাকে ছাপিয়ে ক্ষমতা হাতিয়ে নেবার নেশাগ্রস্ততা– জনস্রোতে ভেসে যাওয়া কথার স্রোতের মতো চিরন্তন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ উপলব্ধি থেকে সরে এসে যন্ত্র সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায়। 'সুড়ঙ্গ' নাটকে নাট্যকার মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কার্যকারণের ইঙ্গিত দিয়েছেন রূপক, সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে।

> রূপক রচনার উদ্দেশ্য পরিচিতি তথ্য বা তত্ত্বকে নবতর আঙ্গিকে রস-সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করা, যাতে রসবোদ্ধা পাঠক বা শ্রোতার জ্ঞানের ক্ষেত্র হয় সম্প্রসারিত। রূপক রচনা মূলত প্রকাশ-মাধ্যম। আর, সংকেতের আবেদন গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভূতির কাছে। সাংকেতিকতা মূলত চিন্তা-মাধ্যম। মানুষের দৃষ্টি সীমার বাইরে যে অদৃশ্যলোক বিরাজমান, তাকেই সাহিত্যিক তার চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করে সে-অনুভূত-সত্যকে প্রত্যয়-সত্যতা দান করেন। সুতরাং রূপকের মতো সাংকেতিকতা শুধু অস্পষ্ট বা ঈষৎ আভাসিত বস্তুর বিকল্প মাত্র নয়। একটি অক্ষর, একটি চিহ্ন, একটি শব্দ বা বাক্য অথবা বস্তুর প্রতীক সাহিত্যিকের বিশেষ ব্যঞ্জনাত্মক শিল্পময় সৃষ্টি এবং বিষয়বস্তুতে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৯]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র নাটকসমূহ ভাবনার নবতর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয়, ভাবনার ক্ষেত্রে পরিধি সম্প্রসারিত করে দেয়। চিন্তার খোরাক জোগায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র লেখনীর আঁচড়। অক্ষর,

শব্দ, বাক্যের মধ্য দিয়ে প্রাণময়তায় নাড়া দেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। তাঁর লেখনীতে সাংকেতিক অর্থময়তা আপনাকে ভাবায়, বক্তব্যে অনুরণন থাকে।

রাবেয়া–"একটি বিশেষ জায়গায় ফাঁকা আওয়াজ হয়। সেখানে চাপ দিলেই ইটটা ঘুরে যায়। তারপর ডালাটা উঠে আসে, সিন্দুকটা অনেক নীচে। নাবতে হয়... ও, অনেক কিছু আছে। সোনা, মহর। অমন কাঁপছেন কেন?[২০]

আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তু পাবার জন্য মানুষ আতিপাতি হাতড়ে নাভিশ্বাসে দৌড়াচ্ছে চিরটাকাল। সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, সোনা-মোহর অর্থাৎ অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু পাবার দৌড়ের মত্ততা-জনরবের মতো অন্তঃসারশূন্য কথার তুবড়ি। ক্ষমতা আয়ত্ব করে নেবার প্রবণতা বর্তমান যন্ত্র-সভ্যতার সময়ে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাবেয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ক্ষমতার ঊর্ধ্বগামিতাকে বার বার কটাক্ষ করেছেন।

রাবেয়া– "কিন্তু সবটাই যে মজা চিন্তায় চিন্তায় সকলের মগজ গলে ঘিলু হয়ে গেল অথচ আমি দিব্যি শুয়ে আছি। আমার নাকি খুব অসুখ। তারপর আপনি এলেন ফকির সেজে। ঠিক যেন রূপকথার মতো।"[২১]

সুড়ঙ্গ নাটকে নাট্যকার দু'রকম সিন্দুককে পাশাপাশি রেখেছেন। রাবেয়া ব্যতীত নাটকের চরিত্রসমূহের সিন্দুক হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য সীমানায় যাবার জন্য চড়াই-উৎরাই দৌড় যেখানে আয়েসী জীবনের জাগতিক উপাচার নিহিত। রাবেয়ার সিন্দুক হলো প্রাণময়তা-অন্তর্লোক, যেখানে প্রেম, ধী-শক্তি উদ্বেলিত করে রাখে রাবেয়াকে। নাট্যকার রাবেয়ার ঘরে রেখেছেন মানুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সিন্দুককে। প্রত্যেকেই রাবেয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় এবং শেষপর্যন্ত প্রাণময়তার কাছে হেরে যেতে হয়। নাট্যকারের সাংকেতিকতা এই ব্যঞ্জনা বহন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রাবেয়া হলো লেখকের মনে জমা হয়ে থাকা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব। বাস্তবতার সাথে মানুষের বিশ্বাসের সংঘাতকে জারি রাখে রাবেয়ার ভান।

রাবেয়ার অসুস্থতার ভানের সাপেক্ষে পটভূমি তৈরি করে নিয়ে নাট্যকার বলতে চেয়েছেন বস্তুতান্ত্রিক জগতে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার টানাপড়েনের কথা। প্রকৃতপক্ষে রাবেয়া ভান করে না অথবা রাবেয়া অসুস্থ নয়। রাবেয়া ব্যতীত নাটকের প্রতিটি চরিত্র পার্থিব মোহগ্রস্ততায় আক্রান্ত। মানুষের নিজের অবস্থানে কেউ সুস্থ স্বাভাবিক নন। প্রতিটি চরিত্র বৈষয়িক মোহে পক্ষপাতদুষ্ট বিধায় সেই সাপেক্ষে প্রতিটি চরিত্র অসুস্থ। রাবেয়াকে বৈষয়িক বিষয়াদি আচ্ছাদিত করতে পারেনি। রাবেয়া ভান করে বস্তুতান্ত্রিক মানুষগুলোর মেকি সারমর্মকে উন্মোচিত করে দেয় যেটা বস্তুবাদী মানুষের কথার আঁটুনিতে অটুট থাকে। যুবক শ্রেণির শ্রমের অপব্যবহার, আড়ম্বর মোড়ানো ফাঁকা গন্তব্যের লক্ষ্যবস্তু, রেজ্জাক এবং ডাক্তারের কর্তৃত্বের দৌড়–সমাজের এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার ড্রেন তৈরি হয়েছে রাবেয়া ভান করে তা পাঠককে জানান দিয়েছে। রেজ্জাক, কলিম, যুবক এবং ডাক্তারের মাঝে ক্ষমতার প্রলোভনে দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। জট পাকিয়ে

একে অন্যকে ছাপিয়ে দৌড়াতে চায়। রাবেয়া ভান করে জট ছাড়িয়ে দেয়। তার ফিক করা হাসি দিয়ে, সহজ সত্তা দিয়ে দ্বন্দ্ব থামিয়ে দেয়। মুচকি হাসি দিয়ে সে বৈষয়িক জগৎকে হার মানায়। রাবেয়ার মধ্যদিয়ে নাট্যকার আমাদের অকপট হতে বলেছেন, আমাদের আত্মার কাছে ফিরতে বলেছেন নাট্যকার।

নাটকে নারীর মধ্যদিয়ে মানবিক সত্তার সংজ্ঞা জারি রেখেছেন নাট্যকার। মানুষ যে সমস্ত মানবীয় গুণাবলির আধারে মানুষ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে, নাট্যকার রাবেয়ার চমকপ্রদ কথা, ব্যঙ্গ, বক্তব্যের অন্তরালে সেই ধী-শক্তি নিহিত রেখেছেন। তিনি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জেন্ডার ধারণাকে বহাল রেখেছেন রাবেয়ার কিশোরী বয়সের পরিসরে।

পনের-ষোল বছরের রাবেয়াকে তার পিতা বিয়ে দিতে চায়। কিশোরী রাবেয়ার বিয়েতে আপত্তি নেই। অতএব বিয়েটি সমাজসম্মত। অপরিণত বয়সের বিয়ে আইনি নীতিমালায় স্বীকৃত না থাকলেও জেন্ডার ধারণায়নের ধারা থেকে সমাজ তাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পনের-ষোল বছরের মেয়েকে বিয়ে দেবার ক্ষেত্রে মেয়ের মতামতের তোয়াক্কা করা হয় না। তদুপরি বিয়েতে মেয়ের অমত না থাকলে সমাজমনস্কতায় বিষয়টি আরো শক্তপোক্ত হয়ে স্থান দখল করে নেয়।

পনের-ষোল বছরের কিশোরীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আত্মসচেতনতা থাকে না। সেক্ষেত্রে পিতামাতার মতামতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পিতামাতার সিদ্ধান্ত, পছন্দকে তারা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পিতামাতার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার দু'রকম যুক্তি এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বহাল থাকে। প্রথম যুক্তি হলো, 'রাজা যেমন কখনও ভুল করেন না তেমনি পিতামাতার সিদ্ধান্তে সন্তানের অমঙ্গল হয়না'; দ্বিতীয়ত, পিতামাতার বাধ্য সন্তান হয়ে 'ভালো-মেয়ে' 'লক্ষ্মী-মেয়ে' বিশেষণে ভূষিত হবার প্রবণতা শৈশবকাল থেকে মেয়েশিশুদের মগজে গেঁথে দেয়া হয়। বিভিন্ন বিশেষণে ভূষিত হয়ে আড়ষ্টতায় বেড়ে উঠবার প্রবণতা এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ- পরিবারে জেন্ডার ধারণায়নে বিদ্যমান থাকে।

কলিম– ..."আপনার মেয়ের আরোগ্য চাইলে আর কালক্ষেপ করবেন না। তবে একটি শর্ত আছে, আমি যখন এবাদত করব তখন এ-ঘরে কেউ থাকতে পারবে না।"

রেজ্জাক– (সন্দিগ্ধ ভাবে) "কেউ না? আমিও কি থাকতে পারি না?"

রেজ্জাক– "ঘরে কি ঝিটাও থাকতে পারে না?"[২২]

পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ এবং একই সঙ্গে পুরুষসত্তা বহাল রেখেছেন নাট্যকার। রেজ্জাকের উক্তিতে নারীর শরীরী অনুষঙ্গ বিষয়ক প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে। শৈশব থেকে কৈশোরের প্রাতঃকালে বয়ঃসন্ধিক্ষণে সামাজিক চোখ, ইশারা, ইঙ্গিত সাপেক্ষে নারীকে তার শরীরী অনুষঙ্গ বিষয়ে সচেতন করে দেওয়া হয়ে থাকে। যেহেতু সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জেন্ডার প্রপঞ্চের

প্রোপাগান্ডা পুরোটাই পুরুষ প্রেক্ষাপট পক্ষপাতিত্বে জারি থাকে। তাই পুরুষের আধিপত্য বজায় রাখতে নারীকে ঘরমুখী করা হয়ে থাকে, আব্রুর আড়ালে থাকবার নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ফলত নারী তার নিজস্ব অবস্থান সম্পর্কে সজাগ হতে পারে না। নারীর বয়ঃসন্ধিক্ষণে পরিবারে পিতামাতা কন্যাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। পরিবারে পিতামাতা এবং কিশোরীটির কাছে যে বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে, তা হলো নারীর পরিবর্তিত শরীরী অনুষঙ্গ। নারীর শরীর তখন নারীদের একমাত্র পরিচয়। পরিচিত এবং অপরিচিত জনকে মনে রাখবার লিঙ্গীয়বার্তা হয়ে ওঠে নারীর শরীর।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ রাবেয়াকে দেখেছেন প্রচলিত জেন্ডার ধারণায়নের মধ্য দিয়ে; একইসঙ্গে রাবেয়াকে মানবসত্তার মূর্তমান প্রতিবিম্ব হিসেবে হাজির করে নারীকে প্রচলিত জেন্ডার সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া থেকে টেনে এনেছেন।

'সুড়ঙ্গ' নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৫ সালের 'দৈনিক সংবাদে'র আজাদী সংখ্যায়। বাংলা একাডেমি প্রথম বই আকারে প্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে।[২৩]

নাটকটির বাক্য গঠন, ভাষা সাবলীল হলেও বক্তব্যের দুর্জ্ঞেয় তদপেক্ষা গুরুতর, যেটা কিশোর-কিশোরীদের উক্তিতে আপাতদৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বয়ান কৌশল এবং রূপক, সাংকেতিকতার মধ্য দিয়ে সমাজমানসকে আন্দোলিত করাটাই নাট্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. হায়াৎ মামুদ, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নাটক সমগ্র*, ঢাকা : প্রতীক, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৫৫
২. আতোয়ার রহমান, "পূর্ব পাকিস্তানের শিশুতোষ নাটক (১৯৪৭-১৯৬৭)", কবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, চতুর্দশ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫১
৩. পূর্বোক্ত, কবীর চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, পৃ. ৫১
৪. পূর্বোক্ত, হায়াৎ মামুদ, পৃ. ৫৭
৫. তদেব, পৃ. ৫৮
৬. তদেব, পৃ. ৬০
৭. তদেব, পৃ. ৬১
৮. তদেব, পৃ. ৫৯
৯. তদেব, পৃ. ৫৯
১০. তদেব, পৃ. ৫৯
১১. তদেব, পৃ. ৬৭
১২. তদেব, পৃ. ৭০

১৩. Kathleen Morneer Ralph Rausch, *NTC's Dictionary of LITERARY TERMS,* New Delhi: viva books private Ltd, p. 236
১৪. পূর্বোক্ত, হায়াৎ মামুদ, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৬৭
১৬. তদেব, পৃ. ৬৯
১৭. তদেব
১৮. তদেব, পৃ. ৭০
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রক্তকরবী*, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, মার্চ ১৯৯৮, পৃ. ৬
২০. পূর্বোক্ত, হায়াৎ মামুদ, পৃ. ৬৩
২১. তদেব, পৃ. ৬২
২২. তদেব, পৃ. ৬১
২৩. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, *সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র নাটক জীবনদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টি*, ঢাকা: অন্বেষা, একুশে বইমেলা ২০০৮, পৃ. ৭৩

গ্রন্থ-সমালোচনা

হারুন-অর-রশিদ, *সোহরাওয়ার্দী বনাম বঙ্গবন্ধু*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা: ২০২১, পৃ. ১০১, মূল্য: ৩৫০/-

বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসে যে ক'জন নেতার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাদের মধ্যে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও গবেষক হারুন-অর-রশিদ তাঁর 'সোহরাওয়ার্দী বনাম বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বের মধ্যে– যারা বাস্তবে ছিলেন 'গুরু-শিষ্য'– একটি তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছেন। গুরু-শিষ্য হলেও সময়ের পরিক্রমায় এ-দুজনের মধ্যে একে অপর থেকে স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি হয়। গবেষক হারুন-অর-রশিদের আলোচনায় এই স্বতন্ত্র ধারার বিশ্লেষণ গ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। লেখকের মতে, এ-দুজনের মধ্যে যেমন অমিল রয়েছে, তেমনি মিলও রয়েছে। এ দুজনের মধ্যে অমিল হচ্ছে: সোহরাওয়ার্দীর জন্ম হয় বঙ্গবন্ধুর বহু পূর্বেই, সঙ্গত কারণে তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় বঙ্গবন্ধুর চেয়ে এগিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী জন্মেছেন পশ্চিমবঙ্গের একটি উচ্চবিত্ত পরিবারে, আর বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলেন পূর্ববাংলার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে। সোহরাওয়ার্দীর পরিবারের ভাষা ছিল প্রধানত উর্দু। আর বঙ্গবন্ধুর পরিবারের ভাষা ছিল বাংলা। কিন্তু, দু'জনই বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন প্রতিজ্ঞ। উভয়েই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী। ছিলেন অখণ্ড বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার সমর্থক। কিন্তু, ১৯৪৭ সালের দেশভাগ দুজনের রাষ্ট্রভাবনাকে স্বতন্ত্র পথে চালিত করে। গবেষক হারুন-অর-রশিদের গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে এসে পাঠক হয়তো হোঁচট খাবেন। কেননা, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬৩ সন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন কিন্তু লেখক বঙ্গবন্ধুর আলোচনাকে বিস্তৃত করে ১৯৭৫ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। তবে পুরো গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত পাঠ থেকে যেটি বুঝা যায় তা হলো বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দী থেকে শুধু স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভাবনা ধারণই করতেন না; বরঞ্চ তা তিনি বাস্তবায়ন করেও এর প্রমাণ করেন। সোহরাওয়ার্দী জীবিত থাকলেও লেখকের ইঙ্গিতে এটা স্পষ্ট দুজনের পথ আলাদাই থাকত। যদিও এতে গুরু-শিষ্যের মধ্যে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবোধের জায়গাতে কোন ফাটল সৃষ্টি হতো না এটি নিশ্চিত করে বলা যায়। প্রথম অধ্যায়ে একটি মুদ্রণ প্রমাদ চোখে পড়ে যেখানে উল্লেখিত হয়েছে বিডিআরের কথা (বর্তমান বিজেপি)–এটি হবে বিজিবি (পৃ.২৭)–পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করলে অধ্যায়টি একটি অসাধারণ ভূমিকা হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। একজন

বড় নেতার গুণ হচ্ছে তিনি তার উত্তরাধিকার রেখে যেতে সফল হন। সোহরাওয়ার্দী নতুন নেতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

একজন বড় রাজনীতিবিদ হতে তিনি বঙ্গবন্ধুকে উৎসাহিত করেছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধুর সাথে কাকতালীয় পরিচয় হলেও, সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুর মধ্যে যে নেতৃত্বের গুণাবলি ছিল তা খুঁজে পেতে ভুল করেননি। হারুন-অর-রশিদের ভাষ্যে, "তার সাহস, বাগ্মিতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা দেখে তখনই তিনি সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে আসেন" (পৃ. ৩৫)। ১৯৩৯ সালে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। অতঃপর, ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে ভর্তি হন ও বেকার হোস্টেলে আবাসিক হিসেবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ এর দেশভাগ পর্যন্ত সময়পর্বে কলকাতা তথা বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলি বঙ্গবন্ধুর মানস তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এ সকল ঘটনায় বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সমগ্র কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় সমর্থন তেমনি একটি দৃষ্টান্ত।

হারুন-অর-রশিদের গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়, যেটির শিরোনাম 'উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও রাজনৈতিক আদর্শ', সেখানে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, যা লেখকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। লেখক এ অধ্যায়ের শুরুতেই বলেন, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বলা হয় সোহরাওয়ার্দীর মানসপুত্র। দু'জনের চরিত্র ও আদর্শে অনেক ক্ষেত্রে মিল ছিল সন্দেহ নেই। তবে ভিন্নতা বা প্রভেদও কম ছিল না" (রশিদ ২০২১: ৩৯)। দু'জনের মধ্যে সাযুজ্য বিচারে যে বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য তা হলো উভয়েই রাজনীতিকে দেখেছেন দেশ, জাতি, জনগণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ বা আত্মবিসর্জন হিসেবে। তাঁরা দুজনেই ছিলেন রাজনৈতিক মত প্রকাশে নির্ভীক, সাংগঠনিক দক্ষতার অধিকারী এবং অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার অধিকারী। ১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালে বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্যের পেছনে সোহরাওয়ার্দীর সাংগঠনিক ক্ষমতার ভূমিকা অনন্য। অন্যদিকে, আওয়ামী লীগকে একটি গণভিত্তিক রাজনৈতিক দলে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। ১৯৪৭ সালে অখণ্ড স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে উভয়ের সমর্থন এবং সক্রিয়তা এবং ১৯৪৭-এর পরে সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু উভয়ই স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার (separate election system) স্থলে যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার (joint election) প্রতি সমর্থন তাঁদের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরে। সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করার বিষয়ে তাঁরা দুজনেই একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন।

অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের দুজনের মধ্যে অমিলও ছিল। বঙ্গবন্ধু ছিলেন চেতনার দিক থেকে খাঁটি বাঙালি। স্বাধীনতা উত্তর কালে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তাঁর বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এ চেতনার স্বাক্ষর বহন করে। সোহরাওয়ার্দী চেতনার জায়গা থেকে বাঙালি ছিলেন না। ভাঙা ভাঙা বাংলায় তিনি কথা বলতে ও বক্তৃতা করতে পারতেন। কেন্দ্রীয়

রাজনীতিতে তাঁর অবস্থান তৈরির জন্য তিনি পাকিস্তানের করাচিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। তবে পূর্ব বাংলাই ছিল তাঁর রাজনীতির মূল ভিত্তি। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উভয়ের রাষ্ট্রভাবনা ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁদের মধ্যে এ বিষয়ে মতপার্থক্য তৈরি হয়, কেননা শুরু থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু উভয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে অর্থনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস ছিল সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করতেন, যাতে বঙ্গবন্ধুর আস্থা ছিল না। এই মতপার্থক্যের জায়গা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায়, দুজনের মধ্যে মিল থাকলেও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যগুলো তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশ করে। চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত বঙ্গবন্ধুর প্রথম প্রতিবাদ-এ আমরা এ বিষয়ে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করতে পারি। এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আত্মপ্রত্যয়ী এবং আত্মমর্যাদাবোধে পরিপূর্ণ বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র পরিচয়। ছাত্রলীগের নেতৃত্বে একটি পদে সোহরাওয়ার্দী একজনের নাম প্রস্তাব করলে বঙ্গবন্ধু এর প্রতিবাদ করেন। সোহরাওয়ার্দী এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "Who are you? You are nobody"। বঙ্গবন্ধু তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করেন। পরে সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি হয়।

হারুন-অর-রশিদের পঞ্চম অধ্যায়টির শিরোনাম 'পাকিস্তান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রভাষাসহ বিভিন্ন প্রশ্নে পারস্পরিক অবস্থান'। এ অধ্যায়টিই গ্রন্থটির আলোচনার মূল ফোকাস বললে অত্যুক্তি হবে না। এই অধ্যায়টি রচনায় হারুন-অর-রশিদ কিছু অজানা নতুন তথ্যসূত্র ব্যবহার করেছেন, যা বঙ্গবন্ধুর উপর গবেষকদের জন্য নতুন সহায়ক সূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও সম্পাদনায় ৬ খণ্ডে প্রকাশিত Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Dhaka, Hakkani Publishers, 2018, 2019 & 2020)।

এই অধ্যায়ের আলোচনায় হারুন-অর-রশিদ বঙ্গবন্ধু এবং সোহরাওয়ার্দীর রাষ্ট্রভাবনার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭ সালে লাহোর প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করে বহুমাত্রিক রাষ্ট্রভাবনার ধারাবাহিকতায় সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধু পূর্ব ভারতে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে জনমত গঠনে সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। '৪৭ এর পর খণ্ডিত বাংলার পূর্বাংশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হলে সোহরাওয়ার্দী এই বাস্তবতাকে মেনে নেন। যদিও এই নবীন রাষ্ট্রের দুই অংশ ছিল ভারতের ভূ-খণ্ড দ্বারা বিভক্ত এবং দূরত্ব হাজার মাইলের অধিক। সোহরাওয়ার্দী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ব বাংলা কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন-সার্বভৌম সত্তা নিয়ে টিকে

থাকতে পারবে না। সোহরাওয়ার্দী আজীবন পাকিস্তানের অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল পাকিস্তান একটি ঔপনিবেশিক ধাঁচের রাষ্ট্র এবং এ রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে বাঙালিদের বের না হয়ে আসা পর্যন্ত তাদের জাতীয় মুক্তি নেই (রশিদ ২০২১: ৬১)। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান রাষ্ট্রে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বঙ্গবন্ধু এবং সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে ব্যবধান তৈরি করেছিল তা হচ্ছে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিতর্ক নিয়ে। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন পূর্ব বাংলার জন্য 'বাঙলা'কে রাষ্ট্রভাষা করা। ২৯ এপ্রিল এক বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা করেন, বাঙলাকে আমরা অন্যতম রাষ্টভাষা করবই। সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু এবং বাংলা এর পক্ষে মত দেন। সোহরাওয়ার্দী আন্তঃআঞ্চলিক ভাষা হিসেবে অন্তবর্তীকালীন সমাধানস্বরূপ ইংরেজি ভাষার পক্ষে সুপারিশ করেন। তবে, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাঙালিদের আবশ্যিকভাবে উর্দু শিক্ষার পরামর্শ দেন (রশিদ ২০২১:৬৫)। দু'টি রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর সমর্থন সত্ত্বেও বাঙালি শিক্ষার্থীদের ওপর সরকার কর্তৃক উর্দুভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হলে তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরুর ঘোষণা সোহরাওয়ার্দীকে খুবই ক্ষুব্ধ করে (রশিদ ২০২১: ৬৬)।

তৃতীয়ত, সোহরাওয়ার্দী এবং বঙ্গবন্ধুর মধ্যে মতপার্থক্যের একটি জায়গা ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ-এর নামকরণ নিয়ে। সোহরাওয়ার্দী 'জিন্নাহ আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করেছিলেন। ব্যক্তির নামে দলের নাম রাখার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ছিল স্পষ্ট: 'কোন ব্যক্তির নাম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগ করতে চাইনা' (রশিদ ২০২১: ৬৯)। বঙ্গবন্ধুর এ বক্তব্যের সাথে সোহরাওয়ার্দী সমঝোতায় আসতে বাধ্য হন।

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালে মোহাম্মদ আলীর (বগুড়া) 'কেবিনেট অব ট্যালেন্টস' খ্যাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর যোগদান বঙ্গবন্ধুর আদৌ পছন্দনীয় ছিল না। সোহরাওয়ার্দী এ মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে, তিনি এর বিরোধিতা করেন এবং বলেন, 'এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিত হয় নাই, আপনি বুঝতে পারবেন' (রশিদ ২০২১: ৭১)।

পঞ্চমত, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর 'সংখ্যাসাম্য' নীতি বঙ্গবন্ধু মনে মনে পছন্দ করতেন না। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণে জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের পক্ষে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৫৬ সালে এই নীতি প্রত্যাখ্যান করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাঙালিদের অধিকার প্রদানের বিষয় সমর্থন করে সংখ্যাসাম্য নীতি প্রত্যাখ্যান করেন।

ষষ্ঠত, বঙ্গবন্ধু মনে মনে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছিলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী ছিলেন কট্টর কমিউনিজম-বিরোধী এবং পাশ্চাত্য, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘেঁষা।

সপ্তম, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মার্কিন ঘেঁষা। আর বঙ্গবন্ধু ছিলেন জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশ্বাসী। যদিও দলীয় সংহতি বজায় রাখতে ১৯৫৭ সালে সোহরাওয়ার্দীর মার্কিন ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতিকে তিনি সমর্থন করেছিলেন।

অষ্টমত, পাকিস্তানের ২৩ বছরে বঙ্গবন্ধুকে ১২ বছরেরও অধিক সময় কারাগারে কাটাতে হয় এবং দুবার ফাঁসির মঞ্চ থেকে তবে জীবন রক্ষা পায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রে সোহরাওয়ার্দীকেও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তবে, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঐ নির্যাতনের কোনো তুলনা হয় না। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসন আমলে ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ মাস ১৮ দিন পর ১৯ মে আগস্টে তিনি মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর কারাভোগের হিসাবটিতে একটি ভুল রয়েছে। আসলে লেখকের উল্লেখিত তারিখ অনুসারে বঙ্গবন্ধুর কারান্তরীণ সময় ৮ মাস ১৮ দিন না হয়ে তা আনুমানিক ৬ মাস ১৮ দিন হয়। আশা করি পরবর্তীতে এ তথ্যভ্রান্তি সংশোধন করা হবে (পৃ. ৮১)। এ ছাড়াও, আইয়ুব সরকার EBDO (Elective Bodies Disqualification Order)-এর আওতায় ৭ বছরের জন্য তাঁকে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করে।

এ পর্যন্ত '৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানের রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দী বনাম বঙ্গবন্ধুর স্বতন্ত্র রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় তুলে ধরা হলো। মতপার্থক্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধের প্রকৃতি বা রূপ ছিল খুবই আন্তরিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সোহরাওয়ার্দী বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন পুত্রস্নেহে। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু সোহরাওয়ার্দীকে দেখেছিলেন পিতৃসুলভ ভক্তি, শ্রদ্ধায়।

তাঁদের উভয়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত কোনো মৌলিক বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলেও তা কখনো দ্বন্দ্ব দ্রোহে রূপ নেয়নি। পরস্পর পরস্পরের অবস্থান সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না, তাও নয় (উদ্ধৃত, রশিদ ২০২১: ৯০)। বঙ্গবন্ধুর জন্য এক পর্যায় পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতা আবশ্যকীয় ছিল। তাই বলে উভয়ের সম্পর্ক নিছক পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট এরূপ বিষয় ছিল না। তা ছিল আরও গভীর, এক বিশেষ অনুভূতির (পৃ. ৯১)।

উপসংহারের শেষ দিকে এসে (পৃ. ৯১) লেখক সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত জীবনের নিঃসঙ্গতার বিষয়টি পুনরাবৃত্তি করেছেন। যা এড়ানো সম্ভব ছিল। বইয়ের উপসংহারে লেখকের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে সোহরাওয়ার্দী স্মরণীয়-বরণীয় অন্যতম জাতীয় নেতা হিসেবে বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। তবে বঙ্গবন্ধু সকলকে ছাপিয়ে স্থান করে নিয়েছেন সবার ঊর্ধ্বে।

গবেষক হারুন-অর-রশিদের এ গ্রন্থটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখে। গ্রন্থটি ছাত্র, গবেষক এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

সাব্বীর আহমেদ*

* অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়